দাদা ভগবান ?

Bengali

দাদা ভগবান ?

(পরমপূজ্য দাদাশ্রীর জীবন চরিত –সংক্ষিপ্ত)

মূল গুজরাটী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : শ্রী অজীত সি প্যাটেল,
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ- ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Right reserved – Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City,
Ahmedabad- Kolol Highway,
Adalaj, Dist: Gandhinagar-382421 , Gujarat, India.

No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsever without written permission from the holder of his copyrights.

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্য মূল্য : ৩০ টাকা

প্রথম মুদ্রণ : November, 2019.

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০

মুদ্রক : অম্বা অফ্‌সেট
বি-99, ইলেক্ট্রনিক্‌স্ জি.আই.ডি.সি.
কে-6 রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -382044
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৮১/৪২

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্
নমো সিদ্ধাণম্
নমো আয়রিয়াণম্
নমো উবজ্ঝায়াণম্
নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্
এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;
সব্ব পাবপ্পণাশণো
মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;
পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১.
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২.
ওঁ নমঃ শিবায় ৩.
জয় সচ্চিদানন্দ

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্ত ভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার – উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ – এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানীপুরুষ শ্রীঅম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে তাঁর শ্রীমুখ থেকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন এবং সম্পাদনা করে পুস্তক-রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। এই পুস্তকে পরম পুজনীয় দাদা ভগবানের স্বমুখ থেকে নির্গত সরস্বতীর, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যাহাতে ওনার জীবন চরিত্রের সাথে সাথে আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধী বর্ণন আছে। বিজ্ঞ পাঠক অধ্যয়ন করতেই, ওনার যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়েছিল সেই আত্মসাক্ষাৎকার পাওয়ার ভুমিকা নিশ্চিত ভাবে হয়ে যায়, এরকম অনেকের অনুভব হয়েছে।

'অম্বালাল ভাই' কে সবাই 'দাদাজী' বলতেন। 'দাদাজী' অর্থাৎ পিতামহ আর 'দাদা ভগবান' তো উনি ভিতরের পরমাত্মা কে বলতেন। শরীর ভগবান হতে পারে না, এ তো বিনাশী। ভগবান অবিনাশী আর তাঁহাকে উনি 'দাদা ভগবান' বলতেন, যা জীবমাত্রের ভিতরে বিদ্যমান।

প্রস্তুত অনুবাদে বিশেষ রূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এই রকম অনুভব করেন। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতে বললে, "আমার হিন্দী মানে গুজরাটী, হিন্দী, আর ইংরেজির মিশ্রন, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে, তখন ভালই হবে"।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান-এর যর্থাথ আধার, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাটী ভাষাতেই অবগত হতে পারেন। যিনি জ্ঞান-এর গভীরে যেতে চান, জ্ঞান-এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, তিনি এই উদ্দেশ্যে গুজরাটী ভাষা শিখে নিন, এই আমাদের নম্র বিনতি।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময় ভিড়ে ভর্তি সুরাট রেলস্টেশনের প্লাটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল বসেছিলেন। সোঁনগড় ভ্যারা থেকে বড়োদা যাবার জন্য, তাপ্তি-ভ্যালি ট্রেন থেকে নেমে বড়োদা যাবার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় প্রকৃতি রচনা করলেন অধ্যাত্ম মার্গের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য !

অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য প্রযত্নশীল 'দাদা ভগবান', অম্বালাল মূলজীভাই রূপী মন্দিরে প্রকৃতির ক্রমানুসারে অক্রম স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে প্রকট হলেন। এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হলো ! জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দৃষ্টিগোচর হলো আর সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ বিলয় হয়ে গেলো ! জগত কি ? জগত কিভাবে চলছে ? আমি কে ? এরা সবাই কে ? কর্ম কি ? বন্ধন কি ? মুক্তি কি ? মুক্তির উপায় কি ?..... এমন অসংখ্য প্রশ্নের রহস্য প্রকাশ হলো। এইভাবে প্রকৃতি জগতের চরণে এক অনুপম সম্পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করল আর এর মাধ্যম হলেন শ্রী এ. এম. প্যাটেল, ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, কন্ট্রাকটর ব্যবসায়ী, তবুও পরম 'সত্য'কে জানার, সত্যকে পাওয়ার আর বাল্যাবস্থা থেকেই সত্ স্বরূপের কামনা রাখার এই ভব্য পাত্রেই 'অক্রম বিজ্ঞান' প্রকট হলো।

ওনার যা প্রাপ্তি হয়েছিল সেটা এক আশ্চর্য্য তো ছিলই। কিন্তু তার থেকেও বড় আশ্চর্য্য ছিল, তিনি যা দেখেছিলেন, জেনেছিলেন, আর অনুভব করেছিলেন সেইরকম প্রাপ্তি অন্যকেও করানোর সমর্থতা ! নিজে নিজের আত্মকল্যাণ করে মুক্তি পাওয়া অনেক আছেন কিন্তু নিজের মতো হাজারো জনকে মুক্ত করার ক্ষমতা তো কেবল তীর্থঙ্কর অথবা জ্ঞানীর মধ্যেও বিরল জ্ঞানীর মধ্যেই হয়। এমন বিরল জ্ঞানী যিনি এই কলিকালের অনুরূপ 'ইন্সটেন্ট' আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির অদ্ভূত মার্গ খুলে দিয়েছেন যা 'অক্রম' নামে প্রচলিত হয়েছে। 'অক্রম' মানে অহংকারের ফুলস্টপ (পূর্ণ বিরাম) মার্গ আর 'ক্রম' মানে অহংকারের কমা (অল্পবিরাম) মার্গ। অক্রম' মানে যেটা ক্রমে

নয়। ক্রম মানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর অক্রম মানে লিফ্টে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাওয়া। ক্রম মুখ্য মার্গ যেটা নিয়মিত রূপে হয়। আর 'অক্রম' অপবাদ মার্গ, 'ডাইভার্শন'।

ক্রম মার্গ কতদুর চলবে ? যতক্ষণ পর্যন্ত মন-বচন-কায়ার একতা থাকে। অর্থাৎ যেমন মনের মধ্যে হয় তেমন বাণীতে হয় আর ব্যবহারেও হয়, যা এই সময়ে অসম্ভব কেননা ক্রমের সেতু এখন ভেঙ্গে গেছে আর প্রকৃতি মোক্ষ মার্গ চালু রাখার জন্য অন্তিম অবসর রূপে এই 'ডাইভার্শন (বিকল্প রাস্তা)' অক্রম মার্গ সংসারে সহজলভ্য করিয়েছেন। এই অন্তিম অবসর কে যে ধরতে পারবে সে পার পেয়ে যাবে।

ক্রম মার্গে পাত্রের শুদ্ধি করতে করতে, ক্রোধ- মান-মায়া-লোভকে শুদ্ধ করতে করতে অবশেষে অহংকার পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে হয়, যাতে ক্রোধ-মান-মায়া- লোভের পরমাণু মাত্র না থাকে , তখন অহংকার পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় যায় আর শুদ্ধাত্মা স্বরূপের সাথে অভেদ হয়ে যায়।

এই কালে ক্রমিক মার্গ অসাধ্য হয়ে যাওয়ার কারণে এই 'অক্রম বিজ্ঞান' দ্বারা মন-বচন-কায়ার অশুদ্ধি কে আলাদা রেখে 'ডিরেক্ট' (সরাসরি) অহংকার শুদ্ধ করা যায় আর নিজের স্বরূপের সাথে অভেদ হওয়া যায়, এমন সম্ভব হয়েছে। এর পর মন-বচন-কায়ার অশুদ্ধি , ক্রমশ উদয় অনুসারে আসার পর, এর সম্পূর্ণ শুদ্ধি 'জ্ঞানী' র আজ্ঞায় থেকে সহজ রূপে হয়ে যায়।

এই দুষম কালে (কলি কালে) কঠিন কর্মের মধ্যে থেকে সাংসারিক দায়িত্ব আদর্শ রূপে পালন করতে করতে ও 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই লক্ষ্য নিরন্তর স্থির হয়ে থাকে। 'অক্রম বিজ্ঞানের' এই বিচিত্র অবদান তো দেখ ! কখনো শোনা যায় নি, কখনো কেউ পড়েনি এমন অপূর্ব কথা যা একবার তো বিশ্বাস-ও হয় না। তবুও আজ এটা বাস্তব হয়ে গেছে।

এমন আশ্চর্যজনক 'অক্রম বিজ্ঞান' কে প্রকাশিত করার জন্য পাত্রের চয়ন প্রকৃতি কিসের আধারে করেছে, এর উত্তর তো প্রস্তুত

সংকলনে পাত্রের পূর্বাশ্রমের প্রসঙ্গ এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পশ্চাতে ওনার জাগৃতির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করা প্রসঙ্গ গুলো-ই বলা যায়।

জীবনে অম্ল-মধুর সম্পর্ক কার আসে নি ? কিন্তু জ্ঞানী তা থেকে কিভাবে আলাদা থাকতে পারেন ? জীবনের পূর্ণিমা আর অমাবস্যার আস্বাদ, জ্ঞান-অজ্ঞান দশার অনুভবে জ্ঞানীর দৃষ্টি অনন্য, অভিন্ন আর মৌলিক হয়। এমন সামান্য প্রসঙ্গে যেখানে অজ্ঞানী জীবদের হাজারো বার অতিক্রান্ত হতে হয়, কিন্তু তাদের না কোন অন্তর দৃষ্টি খোলে না কোন বেদনের সম্যক দৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হয়। যেখানে জ্ঞানী অজ্ঞান দশাতেও, আরে! জন্ম থেকেই সম্যক দর্শন প্রাপ্ত করার দৃষ্টি রাখেন। প্রত্যেক অবসরে, বীতরাগ দর্শন দ্বারা নিজে সম্যক মার্গের সংশোধন করতে থাকেন। অজ্ঞানী মানুষ যার অনুভব হাজারো বার করে এসেছে, এমন অবসরে জ্ঞানী কোন নতুন নিষ্কর্ষ বের করে জ্ঞানের খোঁজ করে যান।

ওনার বাল্যাবস্থার প্রসংগে যখন ওনার মা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কন্ঠির মালা পরার জন্য জোর দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন – 'প্রকাশ দেখায় সেই আমার গুরু, কুগুরুর তুলনায় বিনা গুরুই ভাল'। এমন প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যবহারকে অদেখা করে বাল্যদশাতেই প্রবর্তমান জ্ঞানীর অদ্ভুত বিচারধারা, অলৌকিক দৃষ্টি আর জ্ঞান দশার প্ররিপ্রেক্ষিতেই দৃষ্টি করে তাহার স্টাডি করা উচিত হবে।

প্রস্তুত সংকলনে জ্ঞানীপুরুষের নিজের বাণীতে সংক্ষিপ্ত রূপে ওনার জীবনের প্রসঙ্গকে সংকলিত করা হয়েছে। এর পশ্চাতে সেই অন্তর আশয় আছে যে প্রকট 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর এই অদ্ভুত দশা থেকে জগৎ পরিচিত হোক আর সেটা বুঝে তা প্রাপ্তি করুক, এটাই অভ্যর্থনা।

ডা: নীরুবেহন অমীন
জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ?

১) জ্ঞান কিভাবে আর কখন হলো ?

অক্রমের এই লব্ধি 'আমাকে' বরদান

প্রশ্নকর্তা : আপনার যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে সেটা কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ?

দাদাশ্রী : এটা আমাকে প্রাপ্ত হয়নি। এটা আমার লব্ধি ।

প্রশ্নকর্তা : নৈসর্গিক রূপে ? অথবা কি প্রাকৃতিক রূপে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দিস ইজ বাট নেচারেল।

প্রশ্নকর্তা : আপনার এই যে উপলব্ধি, যেটা সুরাট স্টেশনে হয়েছে, এরকম সবার হয় না। আপনার হয়েছে, কারণ আপনিও ক্রমিক মার্গে ধীরে ধীরে কিছু করেছিলেন হয়তো ?

দাদাশ্রী : অনেক কিছু, সব কিছু ক্রমিক মার্গেই করেছিলাম, কিন্তু উদয় অক্রম রূপে এসেছে। কারণ কেবলজ্ঞানে অনুত্তীর্ণ হয়েছিলাম ! পরিণাম স্বরূপে উদয়ে এই অক্রম এসে দাঁড়িয়েছে।

'ক্রম-অক্রম' এর ভেদ

প্রশ্নকর্তা : 'অক্রম বিজ্ঞান' কি ? প্রথমে এটা বুঝতে হবে ?

দাদাশ্রী : অহংকারের 'ফুলস্টপ' (পূর্ণ বিরাম) এর নাম 'অক্রম বিজ্ঞান' আর অহংকারের 'কমা' (অল্প বিরাম) এর নাম 'ক্রমিক বিজ্ঞান'। একে আন্তরিক বিজ্ঞান বলা হয়, যা নিজেকে সনাতন সুখের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ নিজের সনাতন সুখ প্রাপ্ত করায়, তাকে আত্মবিজ্ঞান বলা হয়, আর সেটা যে টেম্পোর‍্যারি এডজাষ্টমেন্টের সুখ দেয়, সেই সবকে বাহ্য বিজ্ঞান বলা হয়। বাহ্য বিজ্ঞান অন্ততঃ বিনাশী আর বিনাশকারী হয় আর 'এ' (অক্রম বিজ্ঞান) সনাতন হয় আর সনাতন করে !

জ্ঞানাগ্নি তে পাপ ভস্ম

প্রশ্নকর্তা : এই প্রক্রিয়া কি যে এক ঘন্টাতে মনুষ্যকে চিন্তামুক্ত করাতে পারে ? ওতে কি কোন চমৎকার আছে ? কোন বিধি আছে ?

দাদাশ্রী : কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে জ্ঞানী পুরুষ সমস্ত পাপ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন, জ্ঞানাগ্নি দিয়ে ! সেই জ্ঞানাগ্নি দিয়ে আমি সমস্ত পাপ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিই আর সে চিন্তা মুক্ত হয়ে যায় ।

প্রকাশে কোথাও কোন পার্থক্য নেই

প্রশ্নকর্তা : আপনি কি ভাগবদ্ গীতার থিওরিতে বিশ্বাস করেন ?

দাদাশ্রী : সব থিওরিতে বিশ্বাস রাখি । কেন মানবো না ? এই ভাগবদ্ গীতার থিওরি সব একই হয় কি না ! এতে কোন ডিফারেন্স নেই । আমার থিওরি আর ওতে কোন ডিফারেন্স নেই । প্রকাশে কোন পার্থক্য নেই, রীতির তফাৎ এটা । জ্ঞানের প্রকাশ তো সমানই হয় । এই অন্য মার্গ আর এই মার্গের, সনাতন মার্গের যে জ্ঞান প্রকাশ তা সমানই হয় কিন্তু রীতি আলাদা হয় । এটা অলৌকিক রীতি । এক ঘন্টাতে মনুষ্য মুক্ত হয়ে যায় । 'উইদিন ওয়ান আওয়ার' চিন্তা রহিত হয়ে যায় ।

সাধনা, সনাতন তত্ত্বেরই

প্রশ্নকর্তা : আপনি আগে উপাসনা অথবা সাধনা করেছিলেন ?

দাদাশ্রী : সাধনা তো আমি নানা ধরনের করেছিলাম । কিন্তু আমি এমন কোন সাধনা করি নি যেই সাধনাতে কোন বস্তুর প্রাপ্তি হয় । কারণ আমার কোন বস্তুর কামনা ছিল না । সেইজন্য এমন কোন সাধনার আবশ্যকতা ছিল না ! আমি তো সাধ্য বস্তুর সাধনা করতাম । যা বিনাশী নয়, অবিনাশী, তার সাধনা করতাম । অন্য সাধনা আমি করতাম না ।

জ্ঞান-এর পূর্বে কোন মন্থন ?

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানের পূর্বে কোন মন্থন করেছিলেন ?

দাদাশ্রী : সমস্ত জগতে এমন কোন বস্তু নেই যার জন্য আমি চিন্তা করতে বাকি রেখেছি ! সেইজন্য এই 'জ্ঞান' প্রকট হয়েছে ! এখানে তুমি দুটো শব্দ বলতেই পুরো কথা আমার জ্ঞাত হয়ে যায় । আমার এক মিনিটে পাঁচ-পাঁচ হাজার রিভলিউশন ঘোরে । যে কোন শাস্ত্রের সার দুই মিনিটে বের করে নিই ! পুস্তকে সর্বাংশ হয় না । সর্বাংশ জ্ঞানী পুরুষের কাছে থাকে । শাস্ত্র তো ডাইরেক্শন (দিশা-নির্দেশ) দেখায় !

এই অবতারে মেলে নি কোন গুরু

প্রশ্নকর্তা : আপনার গুরু কে ?

দাদাশ্রী : গুরু তো, যদি এই অবতারে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয় তাহলে তাঁকে গুরু বলা যায় । আমাকে প্রত্যক্ষ কেউ মেলে নি । অনেক সাধু-সন্ত এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে । তাঁদের সঙ্গে সৎসঙ্গ করেছি, তাঁদের সেবা করেছি কিন্তু গুরু করার যোগ্য কেউ মেলে নি । প্রত্যেক ভক্ত, যাহারা জ্ঞানী হয়েছেন, তাঁদের রচনা পড়েছি কিন্তু প্রত্যক্ষ কারো সাথে সাক্ষাৎকার হয় নি ।

কথাটা এরকম যে, আমি শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রজী (গুজরাটে হওয়া জ্ঞানীপুরুষ) কে গুরু মানতে পারি না । কারণ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হলেই গুরু মানা যায় (শ্রীমদ্ এর দাদাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয় নি) ! অবশ্য ওনার পুস্তক এর আধার খুব ভাল হয়েছে । অন্য পুস্তকের আধার ও ছিল কিন্তু রাজচন্দ্রজীর পুস্তকের আধার অধিক ছিল !

আমি শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রজীর পুস্তক পড়তাম, ভগবান মহাবীর এর শাস্ত্র পড়তাম, কৃষ্ণ ভগবান এর গীতা পড়তাম, বেদান্তের খন্ডের বাচন করেছি, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের বইও পড়েছি । মুস্লিমদের সাহিত্যও

পড়েছি। আর এরা সব কি বলতে চায়, সবার বলার আশয় কি, হেতু কি, এই সব জেনে নিয়েছিলাম। সবাই ঠিক, কিন্তু নিজের নিজের শ্রেনীর অনুসারে। নিজের নিজের ডিগ্রীতে ঠিক। তিনশো ষাট ডিগ্রী মানা যায় তো কেউ পঞ্চাশ ডিগ্রীতে এসেছে, কেউ আশি ডিগ্রীতে পৌঁছেছে, কেউ একশো ডিগ্রীতে আছে, কেউ দেড়শো ডিগ্রীতে আছে। সত্য সবারই কিন্তু কারো কাছে তিনশো ষাট ডিগ্রী নেই। ভগবান মহাবীর-এর তিনশো ষাট ডিগ্রী ছিল !

প্রশ্নকর্তা : এই অভ্যাস আপনার কি করে হলো ?

দাদাশ্রী : এই অভ্যাস ? এটা তো কয়েক জন্মের অভ্যাস।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু শুরুতে, জন্মের পর কেমন ছিল ? জন্ম নেওয়ার পর শুরু কোথা থেকে হয়েছে ?

দাদাশ্রী : জন্ম হওয়ার পর এই বৈষ্ণব ধর্মে ঘুরতাম, পরে স্বামীনারায়ণ ধর্মে ঘোরাঘুরি করি, অন্য ধর্মতেও ঘুরি, শৈব ধর্মতেও ঘুরি, তার পর শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রজীর আশ্রমে ঘোরাঘুরি করলাম, তারপর মহাবীর স্বামীর সমস্ত পুস্তক পড়ি, এসব একটার পর একটা চলতে থাকে। এমনই আমার দশা ছিল, সাথে-সাথে ব্যবসায় ও চলতে থাকে।

সিন্সিয়ারিটী তো নিরন্তর বীতরাগের প্রতি-ই

প্রশ্নকর্তা : আপনি এরকম অন্য কিছু করেছিলেন কি ?

দাদাশ্রী : কিছুই না, কিন্তু নিরন্তর বীতরাগীদের প্রতি সিন্সীয়্যারিটি ! কৃষ্ণ ভগবানের প্রতি সিন্সীয়্যারিটি! এই সংসারে কোন রুচি ছিল না। সাংসারিক লোভ একটুও ছিল না। জন্ম থেকেই আমার মধ্যে লোভের প্রকৃতি-ই ছিল না ! আরে ! কোন বড় লোকের বাগানে, যেখানে পেয়ারা, বেদানা, মৌসম্বী থাকে, এমন বড় বড় বাগানে সব বাচ্চারা ঘুরতে যেত, ঐ সময় ফলের পোঁটলা বেঁধে ঘরে নিয়ে যেত কিন্তু আমি এমন কিছু করতাম না। অর্থাৎ লোভ প্রকৃতি-ই ছিল না।

মান এত বড় ছিল কি সংসারে আমার মত আর কেউ নেই। মান, বড় জবরদস্ত মান ! আর সে আমাকে এত বেশী বিধেঁছে, যে শুধু আমিই জানি !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান প্রাপ্তির পূর্বে আপনার কেমন পূর্ণতা ছিল ?

দাদাশ্রী : আমার সম্যকত্ব হবে এমন মনে হতো। বাকি, সমস্ত পুস্তক পড়ে এটা খুঁজে বের করেছি যে 'বস্তু কি ?' এই সব বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম । আর তীর্থঙ্কর, বীতরাগরাই সাঁচ্চা পুরুষ আর বীতরাগীদের মত-ই সত্য, এ ভিতরে বসে গিয়েছিল ! সেটাই অনন্ত কালের আরাধনা ছিল ! অর্থাৎ সব কিছু সেরকমই ছিল। সব ব্যবহার জৈন – বৈষ্ণব দের সাথেই ছিল । কিছু বিষয়ে বৈষ্ণব ব্যবহার কিছু বিষয়ে জৈন ব্যবহার ছিল ! আমি ফুটানো জল সবসময় খেতাম, ব্যবসায় তে বাইরে গেলেও ফুটানো জলই খেতাম। তোমারও এমন জৈন ব্যবহার হবে না ! কিন্তু এটা জ্ঞান অভিব্যক্ত হবার কারণ নয়। এর কারণ তো অন্য অনেক এভিডেন্স-এর এসে এক সাথে মেলা। যদি এরকম না হতো তাহলে অক্রম বিজ্ঞান কি করে প্রকট হতো ? অক্রম বিজ্ঞান চব্বিশ তীর্থঙ্করের সমস্ত বিজ্ঞান। চব্বিশ তীর্থঙ্করের সময়ে যা বোঝা যায়নি, সেই সব বোঝার জন্য এই বিজ্ঞান।

বিশুদ্ধ হৃদয় কে 'বিশুদ্ধ' মেলে

প্রশ্নকর্তা : আপনার অক্রমজ্ঞান কিভাবে প্রকট হল ? নিজের থেকে সহজ রূপে অথবা কোন চিন্তন করেছিলেন ?

দাদাশ্রী : নিজের থেকে 'বাট নেচারেল' (প্রাকৃতিক রূপে) হয়েছে ! আমি এমন কোন চিন্তন করি নি। আমার এত সব কোথা থেকে প্রাপ্ত হতো ? আমার এমন মনে হতো যে অধ্যাত্ম-তে কিছু প্রাপ্ত হবে। শুদ্ধ অন্তরের ছিলাম। শুদ্ধ অন্তর থেকে করেছিলাম, সেইজন্য এমন কোন পরিণাম আসবে, কিছু সম্যকত্ব-র মতো হবে, সেরকম মনে হতো ! সম্যকত্ব –এর একটু ঝলক হবে, তাহার প্রকাশ হবে, তার বদলে এটা তো পূর্ণ রূপে উজ্জ্বল হয়ে গেছে !

মোক্ষে যেতে সংসার বাধা নয়

প্রশ্নকর্তা : আপনি সন্ন্যাস কেন নেন নি ?

দাদাশ্রী : সন্ন্যাসের কোন উদয়-ই ছিল না। এর মানে এটা নয় যে আমার সন্ন্যাসের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু এমন কোন উদয় আমার চোখে পড়েনি আর আমার এই বিশ্বাস ছিল কি মোক্ষ মার্গে সংসার বাধা হতে পারে না, এমন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । সংসার বাধা রূপে হতে পারে না, অজ্ঞান বাধা রূপে আছে ! হ্যাঁ, ভগবান কে এই ত্যাগ মার্গের উপদেশ দিতে হচ্ছে, এটা সামান্য ভাবে করতে হয়েছে। এটা কোন বিশেষ ভাবে করা হয় নি। বিশেষ ভাব তো এই যে সংসার বাধা রূপ নয়, এমন আমি গেরান্টি-র সাথে বলি।

জগতের পুণ্যে এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি

প্রশ্নকর্তা : এই অক্রম জ্ঞান কত জন্মের হিসাব-নিকাশ ?

দাদাশ্রী : অক্রম জ্ঞান যা প্রকট হয়েছে তা অনেক জন্মের হিসাব-নিকাশ, সব কিছু মিলে নিজের থেকে নৈসর্গিক রূপে প্রকট হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : এটা আপনার 'বাট নেচারেল' হয়েছে, কিন্তু কিভাবে ?

দাদাশ্রী: এটা কিভাবে মানে, এর সমস্ত সাইন্টিফিক সারকমস্টেন্‌শিয়েল এভিডেন্স এসে মিলেছে, সেইজন্য প্রকট হয়ে গেছে। এ তো লোককে বোঝানোর জন্য আমাকে 'বাট নেচারেল' বলতে হয় । বাকি তো সমস্ত সাইন্টিফিক সারকমস্টেন্‌শিয়েল এভিডেন্স এসে মিলেছে , সেই জন্য প্রকট হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন এভিডেন্স এসে মিলেছে ?

দাদাশ্রী : সব রকমের এভিডেন্স এসে মিলেছে ! সমস্ত জগতের কল্যাণ হবার আছে বলে, আর সময় ও পরিপক্ক হয়েছে !

এসব হবার জন্য কিছু নিমিত্ত তো চাই ?

জ্ঞান হবার পূর্বের এই দশা

এই দশা কে জ্ঞানাম্‌ক্ষেপকবন্ত বলা হয় । অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধী বিচারের ধারাই ছিঁড়ে না । এই ধারা আমার ছিল, এমন দশা ছিল । হ্যাঁ, কিছু দিন পর্যন্ত লাগাতার এমনই চলতে থাকতো, ধারা ছিঁড়তো না । আমি শাস্ত্রে দেখেছি কি ভাই, এই দশা কি ! তখন আমার বুদ্ধিতে আসে যে এটা তো জ্ঞানাম্‌ক্ষেপকবন্ত দশা চলছে !

আপনার কার আরাধনা ?

প্রশ্নকর্তা : লোকেরা দাদাজীর দর্শন করতে আসে কিন্তু দাদাজী কার সেবা- পূজা করেন ? ওনার আরাধ্য দেবতা কে ?

দাদাশ্রী : ভিতরে ভগবান প্রকট হয়েছেন, ওনার পূজা করি !

'আমি' আর 'দাদা ভগবান' এক নয়

প্রশ্নকর্তা : তাহলে আপনি নিজেকে ভগবান কি ভাবে বলেন ?

দাদাশ্রী : আমি নিজে ভগবান নই । দাদা ভগবান কে তো আমিও নমস্কার করি । আমি নিজে তিনশো ছাপ্পান্ন ডিগ্রীতে আছি আর দাদা ভগবান তিনশো ষাট ডিগ্রীতে আছেন । এই ভাবে আমার চার ডিগ্রী কম আছে, সেইজন্য আমি দাদা ভগবান কে নমস্কার করি ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম কিসের জন্য ?

দাদাশ্রী : কারণ কি, আমাকে এখন চার ডিগ্রী পুরো করতে হবে । আমাকে পুরো করতে হবে না ? চার ডিগ্রী অসম্পূর্ণ আছে, অনুত্তীর্ণ হয়েছি, পরে আবার উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া মুক্তি আছে কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার ভগবান হবার মোহ আছে ?

দাদাশ্রী : ভগবান হওয়া তো আমার বোঝা মনে হয় । আমি তো লঘুতম পুরুষ । এই সংসারে কেউ আমার থেকে লঘু নেই, এরকম

লঘুতম পুরুষ। সেইজন্য ভগবান হতে আমার বোঝা লাগে, লজ্জা পাই।

প্রশ্নকর্তা : যদি ভগবান না হতে চান তাহলে এই চার ডিগ্রী পুরো করার পুরুষার্থ কিসের জন্য ?

দাদাশ্রী : ওটা তো আমার মোক্ষের হেতু। আমাকে ভগবান হয়ে কি পাওয়ার আছে ? ভগবান তো যে-ই ভগবত্ গুণ ধারণ করেন, সেই ভগবান হয়। ভগবান শব্দ বিশেষণ। যে মনুষ্য তার জন্য তৈয়ার হয়, মানুষ তাহাকে ভগবান বলবেই।

এখানে প্রকট হয়েছে, চৌদ্দ লোকের নাথ !!!

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা ভগবান' এই শব্দের প্রয়োগ কার জন্য করা হয়েছে ?

দাদাশ্রী : দাদা ভগবানের জন্য ! আমার জন্য নয়। আমি তো জ্ঞানী পুরুষ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ভগবান ?

দাদাশ্রী : দাদা ভগবান, যে চৌদ্দ লোকের নাথ। যে তোমার ভিতরেও আছে, কিন্তু তোমার ভিতরে প্রকট হয় নি। তোমার ভিতরে অব্যক্ত রূপে আছে আর এখানে (আমার ভিতরে) ব্যক্ত হয়ে গেছে। যে ব্যক্ত হয়ে গেছে, সে ফল দেয়, এমন। এক বার বললেই আমার কাজ হয়ে যায়, এমন। কিন্তু যদি ওনাকে চিনে নিয়ে বলা যায় তাহলে কল্যাণ হয়ে যায়। যদি সাংসারিক দ্রব্য নিয়ে কোন বাধা হয়, সেই বাধাও দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ওতে কোন লোভ করবে না। যদি লোভ করতে যাও তাহলে কোনও সীমা থাকবে না। দাদা ভগবান কে, এ তুমি বুঝতে পারছ তো ?

'দাদা ভগবান'-এর স্বরূপ কি ?

প্রশ্নকর্তা : দাদা ভগবানের স্বরূপ কি ?

দাদাশ্রী : দাদা ভগবানের স্বরূপ কেমন ? ভগবান, আর কেমন ? যার এই ওয়ার্ল্ড (জগৎ) –এ কোন প্রকারের মমতা নেই, যার অহংকার নেই, যার বুদ্ধি নেই, সেই দাদা স্বরূপ !!

আত্মজ্ঞান থেকে উপর আর কেবল জ্ঞান থেকে নীচে

জ্ঞানীপুরুষ-এর কেবলজ্ঞান চার ডিগ্রী কমে আটকে আছে আর আত্মজ্ঞান –এর উপরে গেছে। আত্মজ্ঞানের আগে চলে গেছে আর কেবলজ্ঞানের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছায় নি। এতে মাঝের অংশের যে জ্ঞেয় আছে তার খবর জগৎ পায় না। আমি এই যে যা বলি, ওর থেকে একটি বাক্যও জগৎ জানে না, আভাস-ই হয় না। তবে আমি বলার পর বুদ্ধি দ্বারা সেটা বোঝা যায়, বোঝা যায় না এমন নয়। বুদ্ধি সেই প্রকাশ, এই প্রকাশ দ্বারা সামনের জন যা বলে তা বুঝতে পারা যায় কি যা বলছে তা ঠিক। কিন্তু পরে তা স্মরণে থাকে না। শুধু জ্ঞানী পুরুষের বাক্য এমন তাতে বচনবল থাকার জন্য যখনই দরকার সামনে এসে যায়। যখন সঙ্কটের সময় আসে, তখন এই বাক্য হাজির হয়ে যায়, একেই বচনবল বলে।

সংসার দেখেছি কিন্তু জানি নি পূর্ণ রূপে

আমি কেবলজ্ঞানে অনুত্তীর্ণ মনুষ্য।

প্রশ্নকর্তা : চার অংশ মানে সেটা কোন চার অংশ?

দাদাশ্রী : এই যে নজরে আসে, এই চারিত্রমোহ যা তোমার নজরে এসেছে, যদিও আমার চৈতন্য হয় না, তবু ও সামনের জনের নজরে আসে, সেইটুকু অংশ কম হয়ে আছে। আর দ্বিতীয়ত, সংসার আমি অবশ্য বুঝতে পেরেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত জানতে পারি নি। কেবলজ্ঞান মানে জানতেও পারা চাই, যখন কিনা এটা শুধু বুঝতে-ই পেরেছি।

প্রশ্নকর্তা : যা জানতে পারা যায় নি, তার ভেদ কিভাবে করা যায় ?

দাদাশ্রী : বুঝতে পেরেছি, জানতে পারি নি। যদি জানতে পারতাম তাহলে কেবলজ্ঞান বলা হতো। বুঝতে পেরেছি সেইজন্য কেবল দর্শন বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই 'বুঝতে পেরেছি কিন্তু জানতে পারি নি' এটা আমি বুঝতে পারি নি।

দাদাশ্রী : বুঝতে পারা মানে, এই জগত কি, কিভাবে নির্মিত হয়েছে, মন কি, মনের ফাদার - মাদার কে, এই বুদ্ধি কি, এই চিত্ত কি, অহংকার কি, মনুষ্যের জন্ম কেন হয়, অমুকের জন্ম কিভাবে হয়, এই সব কিভাবে চলে, কে চালায়, ভগবান চালায় কি অন্য কেউ চালায়, আমি কে, তুমি কে, এই সমস্ত বিষয় আমার উপলব্ধিতে এসে যায়। আর দিব্যচক্ষু দ্বারা সব আত্মা নজরে আসে, প্রত্যেক জীবমাত্রে নজরে আসে। অর্থাৎ সব কিছু উপলব্ধিতে এসে যায়, সেইজন্য একে কেবলদর্শন বলা হয়।

বলছে যে সে টেপরেকর্ড

দাদাশ্রী : এটা কে বলছে ? তোমার সাথে কে কথা বলছে ?

প্রশ্নকর্তা : সেই জ্ঞান তো আমার জানা নেই !

দাদাশ্রী : অর্থাৎ এই 'আমি' তোমার সঙ্গে কথা বলছি না। 'আমি' তো ক্ষেত্রজ্ঞ-এর মতো দেখতে থাকি। 'আমি' নিজের ক্ষেত্রেই থাকি। এই তোমার সাথে যে কথা বলছে এ তো রেকর্ড কথা বলছে, কমপ্লীট (পূর্ণরূপে) রেকর্ড। সেই জন্য এর থেকে অন্য রেকর্ড বের করা যায়। এটা পূর্ণরূপে মেকানিকেল (যান্ত্রিক) রেকর্ড।

অর্থাৎ এই যাকে দেখ সে তো ভাদরণ-এর প্যাটেল আর এই যে বলছে (মুখ থেকে যে বাণী বেরোচ্ছে) তা টেপরেকর্ড, অরিজিনেল টেপরেকর্ড ! আর ভিতরে দাদা ভগবান প্রকট হয়েছেন, ওনার সাথে একাত্মভাবে থাকি ! আর কখনো বাইরে বেরিয়ে অম্বালালের সাথেও

একরূপ হয়ে যাই। দুই দিকেই ব্যবহার করতে দিতে হয়। অম্বালালের সাথেও আসতে হয়। সেই সময় ব্যবহারে এসেছে বলা হয়, অন্যথা ভিতরে অভেদতা থাকে !

গুরু পূর্ণিমার দিন পূর্ণদশাতে আত্মচন্দ্র

আমার এখানে তিন দিন উত্তম বলা হয়, নতুন বছরের প্রথম দিন, জন্মজয়ন্তী আর গুরুপূর্ণিমা। এই তিন দিন আমি বাইরের কারোর সাথে কোন ব্যবহার রাখি না, অর্থাৎ আমি সেই সময় নিজের পূর্ণ স্বরূপে একাকার থাকি ! আমি (জ্ঞানী পুরুষ) নিজের স্বরূপে (দাদা ভগবান-এর সাথে) একাকার থাকি, সেইজন্য সেই দর্শনে তোমার ফল প্রাপ্তি হবে ! সেইজন্য সেই পূর্ণ স্বরূপের দর্শন করার মাহাত্ম্য আছে না !

একাদশ আশ্চর্য্য এই অক্রম বিজ্ঞান

ভগবান মহাবীর পর্যন্ত দশ আশ্চর্য হয়েছে আর এটা একাদশ আশ্চর্য। জ্ঞানী পুরুষ ব্যাপারীর রূপে বীতরাগ, ব্যাপারীর ভাবে বীতরাগ। এমন দর্শন হয় তাহাকে অজুবা (আশ্চর্যজনক/বিস্ময়কর) বলা হয় ! দেখুন না, এটা আমার কোট আর টুপি ! এরকম কি কোথাও হয় জ্ঞানীর মধ্যে ! তাঁহার এমন পরিগ্রহতে কি লেনা-দেনা ? যার কিচ্ছু চাই না, তবুও পরিগ্রহে বাঁধা পড়ে আছে ! ওনার কিছু চাই না, আর আছে অন্তিম দশাতে ! কিন্তু মানুষের ভাগ্যে নেই, সেইজন্য সে সংসারী বেশে আছে ! যদি ত্যাগীর বেশে থাকতো তাহলে লাখ-কোটি লোকের কাজ হয়ে যেত ! কিন্তু এই লোকদের পূণ্য এত কাঁচা !

আমি যে সুখ পেয়েছি তা যেন সবাই পায়

প্রশ্নকর্তা : আপনাকে ধর্ম প্রচারের প্রেরণা কে দিয়েছে ?

দাদাশ্রী : ধর্ম প্রচারের এই প্রেরণা সব প্রাকৃতিক। আমার নিজের যে সুখ উৎপন্ন হয়েছে, তাতে এই ভাবনা হয়েছে কি সবার এমন সুখ হোক। এটাই প্রেরণা।

আমাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে কি, 'আপনি জগৎ কল্যাণের নিশ্চিত মনোকামনা কিভাবে পূর্ণ করবেন ?' আপনার বয়স হয়ে গেছে! সকালে উঠে চা খেতে-খেতে দশটা তো বেজেই যায়। 'আরে ভাই, আমার এই স্থুল দেহে কিছু করার নেই, সূক্ষ্মতে সব হয়ে যাচ্ছে।' এই স্থুল তো শুধু দেখানোর জন্য। স্থুলের আধার দিতে হয় কি না ?

হৃদয় সিক্ত করে, জ্ঞানীর করুণা

প্রশ্নকর্তা : আপনি বীতরাগীদের লোকসম্পর্কের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ?

দাদাশ্রী : বীতরাগী ভাব, আর কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এই সময় তো পূর্ণ বীতরাগী-ই নেই না! তুমি যাকে জিজ্ঞাসা করছো সে এই সময় পূর্ণ বীতরাগী নয়! এই সময় আমি তো খটপটিয়া বীতরাগী। খটপটিয়া মানে যে সব সময় সেই ভাবনা তে থাকে কিভাবে জগৎ-এর কল্যাণ হবে। অর্থাৎ কল্যাণের জন্য খটপট করে। বাকি বীতরাগী আর জনসম্পর্কের কোন সম্বন্ধ নেই! পূর্ণ বীতরাগী তো কেবল দর্শন দেয়। অন্য কোন কিছু খটপট করেন না, একটুও খটপট করেন না!

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বীতরাগী যে লোকসম্পর্ক করে তা নিজের কর্ম ক্ষয় করার জন্য ?

দাদাশ্রী : নিজের হিসাব পুরো করার জন্য, অন্যের জন্য নয়। ওদের অন্য কোন ভাবনা থাকে না। সব লোকের কল্যাণ হোক, এই আমার ভাবনা। যেমন আমার হয়েছে সেই রকম সবার কল্যাণ হোক, এই আমার ভাবনা। বীতরাগীদের এমন হয় না। একটুও ভাবনা থাকে না, সম্পূর্ণ বীতরাগ! আর আমার তো এটা এক প্রকারের ভাবনা। সেইজন্য সাত সকালে উঠে আরামে বসে যাই। আর সৎসঙ্গ শুরু করে দিই, যা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে। অর্থাৎ এটা আমার ভাবনা। কারণ আমার মত সুখ প্রত্যেকের প্রাপ্ত হোক!

কিসের জন্য এত দুঃখ !! দুঃখই নেই আর বিনা কারণে দুঃখ ভুগছে। এই অজ্ঞতা দূর হলে দুঃখ ও চলে যায়। এখন অজ্ঞতা কিভাবে যাবে ? বললে যাবে না। দেখালে তবে যাবে। নিজে করে দেখালে তবে যাবে !! সেইজন্য আমি করে দেখাই। একে মূর্ত স্বরূপ বলা হয়। সেইজন্য শ্রদ্ধার মূর্তি বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : আপ্ত পুরুষের বাণী, বর্তন আর বিচার কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : ঐ সব মনোহারী হয়, মনকে হরণ করার মতো, মন প্রসন্ন হয়ে যায়। ওনার বিনয় অন্য রকম হয়। সেই বাণী অন্য রকম হয়। উইদাউট ইগোইজ্‌ম্ (নিরহংকারী) বর্তন (ব্যবহার) হয়। বিনা ইগোইজ্‌ম্-এর ব্যবহার সংসারে কদাচিৎ দেখা মেলে অন্যথা মেলেই না।

জ্ঞানী কাকে বলা হয় ?

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানীর ব্যাখ্যা কি ?

দাদাশ্রী : যেখানে সর্বদা প্রকাশ থাকে। সব কিছু জানে, জানার জন্য কিছু বাকি নেই। জ্ঞানী মানে আলো। আলো মানে কোন প্রকারের অন্ধকার-ই হয় না।

জ্ঞানী ওয়ার্ল্ড-এ কদাচিৎ একজন হয়, দুই জন হয় না। ওদের জুড়ি হয় না। জুড়ি হলে স্পর্ধা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা/প্রতিযোগিতা) হবে। জ্ঞানী হওয়া এটা ন্যাচারাল এডজাস্টমেন্ট (প্রাকৃতিক সমন্বয়সাধন)। জ্ঞানী, কেউ নিজে হতে পারে না।

জ্ঞানী পুরুষ তো মুক্ত হয়েই থাকে। বেজোড় হয়। কেউ ওনার সাথে স্পর্ধা করতে পারে না। কেননা যে স্পর্ধা করে সে জ্ঞানী হয় না।

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব থেকে অপ্রতিবদ্ধ

বীতরাগীরা বলেছেন, কি যে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব থেকে নিরন্তর অপ্রতিবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে, এমন জ্ঞানী পুরুষ-এর চরণারবিন্দ-এর ভজনা করলে সমাধান আসে। কোন দ্রব্য তাকে বাঁধতে পারে না, কোন কাল তাকে বাঁধতে পারে না, কোন ভাব-এ সে বাঁধা পড়ে না আর না কোন ক্ষেত্র তাকে বাঁধতে পারে। সংসারে এই চারটি বস্তুই আছে, যা নিয়ে সংসার খাড়া হয়েছে। যে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল আর ভাব থেকে নিরন্তর অপ্রতিবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে এমন জ্ঞানী পুরুষের চরণারবিন্দ-এর সেবা করার জন্য ভগবান বলেছেন।

না রাগ-দ্বেষ, না ত্যাগাত্যাগ

জ্ঞানী পুরুষ কার নাম যে যার ত্যাগ অথবা অত্যাগ সম্ভব নয়, সহজ ভাবে থাকে। সে রাগ-দ্বেষ করে না। ওনার বিশেষ বিলক্ষণতা কি যে রাগ-দ্বেষ হয় না, এটাই বিলক্ষণতা।

দৃষ্টি হলো নির্দোষ, দেখি জগত নির্দোষ

সারা জগতে আমি কাওকে দোষী দেখি না। আমার পকেট কাটে তবুও আমি দোষী দেখি না। তার উপর করুণা হয়। দয়া আমার ভিতরে নাম মাত্র হয় না। মানুষের ভিতরে দয়া হয়, 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর ভিতরে দয়া হয় না। সে দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমার দৃষ্টিই নির্দোষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি হয়, অবস্থা দৃষ্টি হয় না। সবার মধ্যে সরাসরি আত্মাই চোখে পড়ে।

(২) বাল্যাবস্থা

মার থেকে পেয়েছি অহিংসা ধর্ম

আমার মা আমার থেকে ছত্রিশ বছরের বড়। এক দিন মা কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘরে এত ছারপোকা হয়েছে, তোমাকে কামড়ায়

না ?' উত্তরে মা বলে, " হ্যাঁ, বাবা, কামড়ায় তো। কিন্তু তারা অন্যের মত তো টিফিন নিয়ে আসে না, বলে কি 'আমাকে কিছু দিন, মাই-বাপ !' এই বেচারারা তো কোন বাসন নিয়ে আসে না, যতটুকু খাবার তত টুকু খেয়ে চলে যায়।" আমি বললাম, 'তুমি ধন্য মা ! আর তোমার এই ছেলের ও ধন্য ভাগ্য !'

আমি তো ছারপোকাকেও রক্ত খেতে দিতাম যে এখানে যখন এসেছিস তো ভোজন করে যা। কেননা আমার এই হোটেল (শরীর) এমন যে এখানে যেন কারোর কোন কষ্ট না হয়, এই আমার ব্যবসায় ! সেইজন্য ছারপোকাকেও ভোজন করিয়েছি। এখন ওদেরকে ভোজন না করালে সরকার কি আমাকে কোন দন্ড দিতো ? না। আমার তো আত্মা প্রাপ্তি করার ছিল ! সদৈব চৌবিহার (সূর্যাস্তের আগে ভোজন), সদৈব কন্দমূল ত্যাগ, সদৈব ফুটানো জল, এই সবকিছু করতে কোন চেষ্টা বাকি রাখি নি ! আর এইজন্য, দেখুন, এই প্রাকট্য হয়েছে, সম্পূর্ণ 'অক্রম বিজ্ঞান' প্রকট হয়েছে ! যে সমস্ত দুনিয়া কে স্বচ্ছ বানিয়ে দেয়, এমন বিজ্ঞান প্রকট হয়েছে !

মা-র সংস্কার মার খেতে শিখিয়েছে

আমার মা ও এমন ছিল তো ! মা তো আমাকে সবসময় ভালটাই শেখাতো। ছোট বেলায় একটি ছেলের সঙ্গে মারা-মারি করে ঘরে এসেছিলাম। ওই ছেলেটার রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। মা এটা জানতে পেরে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো, 'বাবা, এই দেখ, ওর রক্ত বেরিয়েছে । এমনি তোকে যদি কেউ মারে আর তোর রক্ত বেরোয় তাহলে আমাকেই তো তোকে ঔষধ লাগাতে হবে কি না ? এই সময় ওই ছেলেটির মাকেও ওর ঔষধ লাগাতে হচ্ছে কি না ? আর ওই বেচারা কত কাঁদছে হয়তো ? ওর কত কষ্ট হয়েছে ? সেইজন্য আজ থেকে তুই মার খেয়ে আসবি কিন্তু কাউকে মেরে আসবি না। তুই মার খেয়ে আসবি, আমি তোকে ঔষধ লাগিয়ে দেবো।' এখন বলুন, এমন মা মহাবীর বানাবে কি বানাবে না ? এমন উচ্চ সংস্কার মা দিয়েছে।

ওতে ক্ষতি কার ?

আমি ছোট বেলায় একটু জিদ্দি ছিলাম। বেশী জিদ হতো না, কখনো-কখনো জিদ হয়ে যেত। তাও আমি হিসাব করলাম যে জিদ করলে কেবল ক্ষতিই হয়, সেইজন্য আমি ঠিক করলাম যে কেউ আমার সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক তবুও আমি কখনো জিদ করবো না। আমি একদিন জিদ করেছিলাম, আর সেদিন সকালের দুধ হারালাম! তারপর সারাদিন কি কি হারালাম, তার হিসাব করলাম। সন্ধ্যা হতেই জিদ থেকে পিছনে ফিরে এলাম।

মাকে আমি কি বলতাম ? 'আমাকে আর বৌদিকে তুমি সমান কেন ভাবো, মা ? বৌদিকে আধাসের দুধ আর আমাকেও আধাসের দুধ ? ওকে কম দেবে।' আমার আধাসের দুধে রাজি ছিলাম। আমার বেশী দরকার ছিল না কিন্তু বৌদির টা কম করতে বললাম, দেড় পোয়া করো বললাম। তখন মা আমাকে কি বললো ? 'তোর মা তো এখানে আছে, ওর মা তো এখানে নেই না! ও বেচারির খারাপ লাগবে! ওর দুঃখ হবে। সেইজন্য সমান সমানই হবে।' তবু আমার সমাধান হতো না। মা বার বার বোঝাতো। অনেক ধরনে বোঝানোর ব্যর্থ প্রযত্ন করতো। সেই জন্য একদিন আমি বেঁকে বসলাম, কিন্তু ওতে লোকসান আমারই হলো। সেইজন্য ঠিক করলাম আর কখনো জিদ্দি হবো না।

কম বয়সেও যথার্থ বোধ

বার বছরের ছিলাম তখন গুরুর কাছে বাধাঁনো কন্ঠি ছিঁড়ে যায়। তখন মা বললো যে, 'আমরা এই কন্ঠি আবার গুরুর কাছে বাধিঁয়ে নেবো।' এতে আমি বললাম, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন এই কুয়াতে ঝাঁপ দিয়েছিল তখন এই কুয়াতে জল ছিল হয়তো, কিন্তু আমি আজ যখন এই কুয়াতে উঁকি মারি তখন বড়-বড় পাথর দেখতে পাই, জল দেখতে পাই না আর বড়-বড় সাপ দেখতে পাই। আমি এই কুয়াতে পড়তে চাই না।' বাপ-দাদা যেখানে পড়েছে সেই কুয়াতে আমাকেও পড়তে হবে এমন লিখে দিয়েছি কি ? ভিতরে দেখুন, জল আছে কি

নেই, যদি আছে তো ঝাঁপ দিন। নইলে জল নেই আর পড়ে গিয়ে মাথা ফাটানোর কি ফায়দা।

তখন গুরু মানে প্রকাশ ধারণ করে এমন অর্থ আমি জানতাম। যে আমাকে প্রত্যক্ষ রূপে জ্ঞান দেয় না, প্রত্যক্ষ প্রকাশ ধারণ করে না তাহলে একটু ঠান্ডা জল ছিটিয়ে অথবা মাথায় এক কলসী জল ঢেলে কন্ঠি বাঁধাতে চাই না। যদি আমার মনে হয় সে গুরু করার যোগ্য তাহলে ঠান্ডা জল কি, হাত কাটতে বলে তো হাত কাটতে দেবো। হাত কেটে নেবে তো কি হবে, অনন্ত অবতার থেকে তো হাত নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি না ? কেউ অস্ত্র দিয়ে হাত কেটে নিলে তো কাটতে দিই কি না ? তাহলে এখানে গুরু কাটে তো কাটতে দেবে না ? কোন ডাকাত কেটে নিলে, লোকেরা কাটতে দেয় কি না ? আর গুরু কাটে তো ? কিন্তু গুরু বেচারা তো কাটবেই না ! কিন্তু যদি কখনো কাটতে বলে তো আপনি এমন না করার কোন কারণ আছে ?

এইজন্য যখন মা বলল যে তোকে 'নিগুরা' বলবে, তখন সেই সময় 'নিগুরা' এর মানে আমি জানতাম না। আমি মানতাম কি এই শব্দ ওদের কোন এডজাষ্টমেন্ট হবে, আর 'নিগুরা' বলে বেইজ্জত করা হয়। কিন্তু এর অর্থ 'বিনা গুরুর' এটা আমি সেই সময় জানতাম না। এইজন্য আমি বললাম কি, লোক আমাকে নিগুরা বলবে, আমি বেইজ্জত হবো, এর থেকে বেশী আর কি বলবে ? কিন্তু পরে আমি এর অর্থ বুঝে গিয়েছিলাম।

না, চাই না এমন মোক্ষ

তের বছর বয়সে স্কুল থেকে সময় পেলেই এখানে এক সন্ত পুরুষের আশ্রমে দর্শন করতে যেতাম। ওখানে উত্তর ভারতের দুই-এক জন সন্ত বাস করতেন। একজন অনেক বড় সন্ত ছিলেন, সেইজন্য আমি তের বছর বয়সেই ওনার চরণ সেবা করতাম। সে আমাকে বলে, 'খোকা, ভগবান তোমাকে মোক্ষে নিয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'মহাশয়, এমন কথা না বললে আমার ভাল লাগবে। এমন

কথা আমার পছন্দ নয় !' ওনার মনে হয়েছে বাচ্চা ছেলে তো, সেইজন্য বুঝতে পারছে না ! আবার আমাকে বললেন, আস্তে-আস্তে তুই বুঝতে পারবি ।' এতে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, মহাশয়' । কিন্তু আমার তো বড়-বড় বিচার আসতে লাগলো কি ভগবান আমাকে মোক্ষে নিয়ে যাবে, তারপর আমাকে ওখানে বসাবে হয়তো, আর ওনার চেনা-জানা কেউ আসলে আমাকে বলবে, 'চল ওঠ এখান থেকে', তখন ? চাই না তোর এমন মোক্ষ ! তার বদলে বৌ-এর সাথে পেঁয়াজের পকোড়া খাও আর মৌজ ওড়াও তো খারাপ কি এতে ? ওর তুলনায় এই মোক্ষ ভালই তো ! যেখানে কেউ তুলে দেবার থাকে আর মালিক থাকে এমন মোক্ষ আমি চাই না ।

অর্থাৎ তের বছর বয়সেই এমন স্বতন্ত্রতা জাগ্রত হয়েছিল কি কেউ মালিক হয় তো এমন মোক্ষ আমার চাই না । আর যদি নেই তো আমার এই কামনা কি কেউ আমার মালিক হবে না আর আমার কোন আন্ডারহেন্ড চাই না । আন্ডারহেন্ড আমার পছন্দ নয় ।

বসে আছি, সেখান থেকে কেউ তুলে দেবে এমন মোক্ষ আমি চাই না । যেখানে মালিক নেই, আন্ডারহেন্ড নেই, এমন বীতরাগীদের মোক্ষ আমি চাই । সেই সময় জানতাম না কি বীতরাগীদের মোক্ষ এমন হয় । কিন্তু তখন থেকেই অনুভব হয়ে গিয়েছিল কি মালিক চাই না । ওঠ এখান থেকে বলে, এমন তোর মোক্ষ আমি চাই না । এমন ভগবান থাকুক নিজের ঘরে । আমার কি কাজ তোর সাথে ? তুই যদি ভগবান তো আমিও ভগবান ! যদিও, কিছু ক্ষণের জন্য তুই আমাকে কাবু করার চেষ্টাতে ছিলি ! আই ডোন্ট ওয়ান্ট (আমি চাই না)! এমন ক্ষিদে কিসের জন্য ? এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের লোভের জন্য ? কি আছে এই লোভে ? পশুর ও লোভ আছে আর আমাদের ও লোভ আছে, তাহলে আমাদের আর পশুর মধ্যে কি অন্তর রইল ?

পরবশতা, আই ডোন্ট ওয়ান্ট

কারো চাকরি করব না এরকম প্রথম থেকেই ধারণা ছিল । চাকরি

করা আমার অনেক কষ্টকর মনে হতো। এমনিতে মৃত্যু এসে যায় তো ঠিক কিন্তু চাকরিতে বস (মালিক) আমাকে বকা-বকি করবে সেটা সহ্যের বাইরে। 'আমি চাকরি করবো না' এটা আমার বড় ব্যাধি ছিল আর এই ব্যাধি আমাকে রক্ষা করেছে। শেষে এক বন্ধু জিজ্ঞাশা করল, 'বড় ভাই ঘর থেকে বের করে দিলে কি করবি ? আমি বললাম, 'পান দোকান করবো।' ওতে রাত দশটা পর্যন্ত লোককে পান খাইয়ে, এগারোটায় ঘরে গিয়ে খেয়ে শুতে পারবো। ওতে যদি তিন টাকা পাই তো তিনেই নির্বাহ করে নেবো আর যদি দু'টাকা পাই তো তাতেই চালিয়ে নেবো, আমার সব রকম ভাবেই নির্বাহ করা আসে, কিন্তু আমার পরতন্ত্রতা একটুও পছন্দ না। পরবশতা, আই ডোন্ট ওয়ান্ট !!

আন্ডারহেন্ড কে সবসময় রক্ষণ দিয়েছি

জীবনে আমার পেশা কি ছিল ? আমার উপরে যারা আছে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা আর আন্ডারহেন্ড (অধীনে কাজ করা লোক)-এর রক্ষা করা। এটা আমার নিয়ম ছিল। মোকাবিলা করবে কিন্তু নিজের থেকে উপরওয়ালার সঙ্গে। সারা সংসার কার আজ্ঞাধীন থাকে ? মালিকের ! আর আন্ডারহেন্ড কে বকা-বকি করে। কিন্তু আমি মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, এর জন্য আমার কোন লাভ হয়নি। আমার এমন লাভের পরোয়াও ছিল না। কিন্তু আন্ডারহেন্ডদের ভাল মতো সামলিয়ে রাখতাম। যে কেউ আন্ডারহেন্ড হোক তাকে সব দিক থেকে রক্ষা করা, এটাই আমার সবথেকে বড় আদর্শ ছিল।

প্রশ্নকর্তা : আপনি ক্ষত্রিয় সেইজন্য ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ক্ষত্রিয়, এটা ক্ষত্রিয়দের আদর্শ, সেইজন্য, পথ চলতে কারো ঝগড়া হয় তো যে হারে, যে মার খায় তার পক্ষে থাকতাম, এটাই আমার ক্ষত্রিয়তা।

দুষ্টামি স্বভাব, শৈশব কালের

আমার তো সব দৃষ্টিতে আসে, ছেলেবেলার দিকে ঘুরে দাড়ালে

ছেলেবেলা দেখতে পাই। সেইজন্য আমি এই সব কথা বলি। পছন্দ হয় এমন কিছু চোখে পড়লে আমি বলি, তা নাহলে আমি কোথায় মনে রাখি ? আমার শেষ পর্যন্ত, শৈশব পর্যন্ত সব কিছু দৃষ্টিতে আসতে থাকে। সারা পর্যায় দৃষ্টিতে আসে। এমন ছিল ..., এমন ছিল ..., তার পর এমন হলো, স্কুলে আমি ঘন্টা বাজার পরে যেতাম, এই সব ঘটনা আমি দেখতে পাই। মাষ্টারমশাই আমাকে কিছু বলতে পারতো না, সেইজন্য বিরক্ত হতো।

প্রশ্নকর্তা : আপনি স্কুলে ঘন্টা বাজার পরে কেন যেতেন ?

দাদাশ্রী : এমন দাপট ! মনে এমন অহংকার ! সেখানে সিধা-সাধা ছিলাম না তাই এমন অবস্থা ! সোজা লোক তো ঘন্টা বাজার আগেই গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পরবে।

প্রশ্নকর্তা : দাপট দেখানো, ওটাকে উল্টা রাস্তা বলে কি ?

দাদাশ্রী : ওটা তো উল্টা রাস্তাই বলে ! ঘন্টা বাজার পরে আমি যাই, যখন কি না মাষ্টারমশাই আগেই এসে যায় ! মাষ্টারমশাই দেরি করে আসে তো ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চাদের তো ঘন্টা বাজার আগে আসা চাই কি না ? কিন্তু এমন গোঁয়ারতুমি। বলবে, 'মাষ্টারমশাই, নিজে মনে কি ভাবেন ?' দেখুন !! আরে ! তোর পড়া-শোনা করার ইচ্ছা না লড়াই করার ? তখন বলে, 'না, প্রথমে লড়াই করবো।'

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মাষ্টারমশাই আপনাকে কিছু বলতে পারতো না ?

দাদাশ্রী : বলতে পারতো, কিন্তু বলতো না। ওনার মনে ভয় ছিল কি বাইরে পাথর মারবো, মাথা ফাটিয়ে দেবো।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আপনি এত দুষ্ট ছিলেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দুষ্ট ছিলাম। আমার মাল (প্রকৃতি, স্বভাব) ই সমস্ত দুষ্ট ! বাঁকা মাল !

প্রশ্নকর্তা : আর এমন হয়েও এই জ্ঞান প্রকট হয়েছে এটাই তো আশ্চর্য্য বলা যায় ।

দাদাশ্রী : 'জ্ঞান' হয়েছে কারণ ভিতরে কোন ময়লা ছিল না ! এই অহংকারের-ই বাধা ছিল কিন্তু মমতা একটুও ছিল না, । সেইজন্য এই দশার প্রাপ্তি হয়েছে । সহজ মমতা ছিল না, লালসা ছিল না কিন্তু যদি কেউ আমার নাম নিতো তাহলে তার বিপদ এসে যেতো । সেইজন্য কিছু লোক পেছন থেকে টিপ্পনি করতো কি এর খুব মেজাজ । তখন এমন ও বলতো, 'আরে, যেতে দিন, অহংকারী ।' অর্থাৎ আমার জন্য কি কি বিশেষণের প্রয়োগ হতো তার পুরো তথ্য আমার কাছে থাকতো । কিন্তু আমার মমতা ছিল না । এটাই প্রধান গুণ ছিল, তারই প্রতাপ এটা ! আর যদি কোন মমতাবান একশো গুণ সেয়ানা হয়, তবু ও সে সংসারের গভীর পর্যন্ত ডুবে থাকে । আমি মমতা রহিত সেইজন্য বাস্তবে মজা এসেছে । এই মমতাই সংসার, অহংকার এই সংসার নয়।

তার পর আমিও অনুভব করি যে এখন আমি সোজা হয়ে গেছি । কাউকে আমাকে সোজা করার জন্য কষ্ট করতে হয় নি ।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আপনি সোজা কিভাবে হয়ে গেলেন ?

দাদাজী : লোকেরা মেরে-পিটে, উল্টা-সিধা করে, এদিকে-ওদিকে চেপে ধরে সোজা করে দিয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : এটা তো পূর্বের অবতার থেকেই শুদ্ধ হয়ে আসছিলেন না ?

দাদাশ্রী : অনেক অবতার থেকেই সোজা হয়ে আসছি , তবে এই অবতারে গিয়ে পূর্ণরূপে সোজা হয়েছি ।

ভাষা শেখার বদলে ভগবানে রুচি

ইংরেজির মাস্টারমশাইকে আমি বলেছিলাম । সে আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন । আমি তাকে বলি যে আপনি যা বলতে চান বলতে পারেন, আমি আপনার এখানে ফেঁসে গেছি । পনেরো বছর ধরে পড়ে

যাচ্ছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত মেট্রিক হচ্ছে না। গোনা থেকে শুরু করে পনেরো বছর হয়ে গেছে কিন্তু মেট্রিক হয় নি। দশ বছরে তো আমি ভগবান কে খুঁজে বের করে ফেলতাম। এত গুলো বছর ব্যর্থ গেল! বিনা কারণে এ-বি-সি-ডি শেখায়! অন্য কারো ভাষা, বিদেশীর ভাষা শেখার জন্য মেট্রিক পর্যন্ত পড়তে হয়? এটা কেমন পাগলামি? বিদেশের ভাষা শেখার জন্য এখানে মানুষের আধা জীবন শেষ হয়ে যায়।

লঘুতম শেখে, মিলে ভগবান

অনন্ত অবতার থেকে একেই জিনিস পড়ে যাচ্ছে আর পরে আবার আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অজ্ঞান পড়তে হয় না। অজ্ঞান তো সহজ রূপেই এসে যায়। জ্ঞান পড়তে হয়। আমার আবরণ কম ছিল, সেইজন্য ত্রয়োদশতম বছরে অনুভূতি হয়ে গিয়েছিল। ছেলে বেলায় গুজরাটী স্কুলের মাস্টারমশাই আমাকে বলেন, 'তুমি এই লঘুতম শেখ।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'লঘুতম মানে আপনি কি বলতে চাইছেন? লঘুতম কেমন হয়?' তখন তিনি বললেন, 'এই যে রকম (সংখ্যা) গুলো দেওয়া হয়েছে, ওর মধ্যে থেকে সবার থেকে ছোট রকম, যা অবিভাজ্য, যাকে আর ভাগ করা যাবে না, এমন সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে।' সেই সময় আমি ছোট ছিলাম কিন্তু লোককে কেমন সম্বোধন করতাম? 'এই রকম টা ভাল না।' মানুষের জন্য 'রকম' শব্দ ব্যবহার করতাম। সেইজন্য আমার এই কথা পছন্দ হয়। অর্থাৎ আমার এমন মনে হল যে এই 'রকম' দের ভিতরেও এমনই কি না? ভগবান সবার ভিতরে অবিভাজ্য রূপে বিদ্যমান। সেইজন্য আমি এর থেকে তৎক্ষনাৎ ভগবান কে খুঁজে বের করেছিলাম। এই সব মানুষ 'রকম'-ই। ওতে ভগবান অবিভাজ্য রূপে থাকে।

আত্মা ছাড়া আর কিছু শিখি নি

ছেলেবেলায় আমি সাইকেল চালাতাম, তখন বাহান্ন টাকায় 'রেলে' কোম্পানীর সাইকেল পাওয়া যেত। ওই সময় সাইকেলে

পাঞ্চার হলে সবাই নিজের নিজের বাড়িতে রিপেয়ার করতো। আমি তো উদার ছিলাম সেইজন্য এক সাইকেল রিপেয়ারওয়ালার কাছে গিয়ে বললাম, 'ভাই, এর পাঞ্চার ঠিক করে দাও।' এতে সবাই আমাকে বলতে লাগলো যে, আপনি বাইরে রিপেয়ার কেন করাচ্ছেন ? এতে করার কি আছে ?' আমি উত্তর দিলাম, 'ভাই ! আমি এখানে এই সব শিখতে আসি নি। এই দুনিয়ায় অনেক জিনিস আছে, সেই সব শিখতে আমি জন্ম নেই নি। আমি তো আত্মা শেখার জন্য এসেছি, আর যদি এই সব শিখতে বসি তাহলে ঐ আত্মার বিষয়ে ততটা কাঁচা থেকে যাবো।' সেইজন্য আমি শিখি-ই নি। সাইকেল চালাতে পারতাম তাও কেমন ? সিধা-সিধি সাইকেলে সওয়ার হতে পারতাম না, সেইজন্য পিছনের ধুরাতে পা রেখে সওয়ার হতাম ! আর কিছু আসে না আর শেখার প্রযত্নও করি নি। এই সব তো আবশ্যকতা অনুসারে শিখে নিতাম। আর বেশী শেখার দরকার ছিল না।

ঘড়ি হল দুঃখদায়ক

আমার কোন দিকে ধ্যান-ই ছিল না। কিছু নতুন শেখার প্রযত্ন করি নি। এটা শিখতে বসি তো ততটা ওতে(আত্মা শিখতে) ঘাটতি থেকে যাবে না ? সেইজন্য নতুন শিখতাম না।

ছেলেবেলায় একটি সেকেন্ডহেন্ড ঘড়ি পনের টাকায় এনেছিলাম। ওটা পরে মাথায় হাত রেখে শুয়ে পরি। ফলে কানে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, সেইজন্য আমি ভাবলাম কি, এটা তো দুঃখদায়ক হয়ে গেলো। সেই জন্য আর কখনো পরি নি।

চাবি ভরতে সময় অপব্যয় করি নি

ঘড়িতে চাবি ভরা আমার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। আমার অংশীদার বলল কি এটা সাত দিনে চাবি দেওয়া ঘড়ি, এটা নিয়ে আসুন। সেইজন্য সাত দিনে চাবি দেওয়া ঘড়ি নিয়ে আসলাম। কিন্তু একদিন চেনা-জানা একজন আসে, বলে কি, 'ঘড়িটা খুব সুন্দর।' এতে আমি বলে দিলাম যে, 'আপনি নিয়ে যান, আমার চাবি দেওয়ার কষ্ট !' এতে আবার

হীরাবা ঝগড়া শুরু করে দিল যে, 'আপনি তো যা মনে আসে সেটাই অন্যকে দিয়ে দেন, এখন আমি বিনা ঘড়িতে সময় কি করে জানবো ?' আমি কখনো ঘড়ির চাবি দিই নি। সেই সময় আমার ভাগ্নে পনের বছর ধরে আমার ঘড়ির চাবি দিতো। আমি তো কেলেন্ডার ও দেখি না! কেলেন্ডার দেখে আমি কি করবো ? কে ছিঁড়বে কেলেন্ডারে পৃষ্ঠা ? আমি কেলেন্ডারের পৃষ্ঠা ও ছিঁড়ি নি। এমন ফুরসত, এমন সময় আমার কোথায় ? ঘড়ির চাবি যদি ঘুরাতে যাই তো আমার চাবি কখন ঘুরাবো ? অর্থাৎ আমি কোন বস্তুর জন্য সময় নষ্ট করি নি।

রেডিও কে মেডনেস বলতাম

এক মিত্র বলেছিল, 'রেডিও আনুন'। আমি বললাম, 'রেডিও ? আর সেটা আমি শুনব ? তাহলে আমার সময়ের কি হবে ?' এটা... অন্যের কাছে শুনেই বিরক্ত হয়ে যাই, আর আবার সেটা আমার কাছে, সেটা কি করে হতে পারে! এইসব মেডনেস (পাগলামি)!

ফোনের উপদ্রবও রাখি নি

আমাকে বলে যে, 'আপনি ফোন লাগান।' আমি বলি, 'না, আমি এই ঝামেলার মধ্যে কেন জড়াই ?' আমি শান্তিতে ঘুমাচ্ছি আর তখনই ঘন্টি বাজতে শুরু করবে, এমন ঝঞ্ঝাট কেন ডেকে আনবো ? যার আমাকে দরকার সে আসবে আমার কাছে। যার দরকার নেই সে কোনদিন আসবে না এখানে। আর আমার কিছুই দরকার নেই। লোকে তো শখের জন্য রাখে যে আমার মর্যাদা বাড়বে। সেইজন্য মর্যাদাওয়ালাদের জন্য ঠিক আছে। আমি তো সাধারন মানুষ, আরামে ঘুমাই, সারা রাত নিজের স্বতন্ত্রতায় শুই। অর্থাৎ এই টেলিফোন কে রাখে ? আবার ঘন্টি বাজলেই হয়রানি শুরু! আমি তো পরের দিনই উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেবো। ঘন্টি বাজলো কি ঘুমের ব্যাঘাত হয়ে গেলো। যদি মশা-ছারপোকা ব্যাঘাত ঘটায় তো সেটা অনিবার্য কিন্তু এটা তো ইচ্ছাধীন, একে কিভাবে বরদাস্ত করবো ?

শুরুতে আমি মোটরকার রাখতাম। ড্রাইভার এসে বলে, 'মহাশয়, অমুক পার্ট ভেঙ্গে গেছে।' আমি তো পার্টের নাম ও জানতাম না। তখন আমার মনে হলো কি এটা তো ফ্যাঁসাদ! ফ্যাঁসাদ তো ওয়াইফ-এর সাথে হয়ে গেছে আর পরিণাম স্বরূপে বাচ্চা হয়েছে। আরো একটা বাজার খাড়া করতে হলে করা যায় কিন্তু এমন দুই-চারটা ফ্যাঁসাদের বাজারের কি আবশ্যকতা ? এমন আর কত বাজার মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবো ?

এই সব তো কমনসেন্স-এর কথা বলা হয়! এই ড্রাইভার এমনিই গাড়ি থেকে পেট্রোল বের করে নেবে আর এসে বলবে, কাকা, পেট্রোল ভরতে হবে ? এখন কাকা কি জানে যে এ কিসের বালাই ? তারপর থেকে আমি মোটরগাড়ি রাখতাম না! পরে সংযোগবশত কোন সময় দরকার হলে বলতাম যে গাড়ি আনো!

ওখানে সুখ দেখি নি

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আমাদের এই সব কিছু চাই আর আপনার কিছুই চাই না এর কারণ কি ?

দাদাশ্রী : ওটা তো তুমি লোকের থেকে শিখে বলছ। আমি লোকের থেকে শিখি নি। আমি প্রথম থেকেই লোকের থেকে বিরুদ্ধে চলা মানুষ। লোক যে রাস্তায় চলে, সেই রাস্তা গোলাকারে আগে গিয়ে ঘুরে যায়, লোক সেই রাস্তায় ঘুরে-ফিরে যায়। যখন কি আমি হিসাব করি যে সোজা গেলে এক মাইল হবে আর ঘুরে গেলে তিন মাইল হবে, যদি আধা গোলাই কেটে দিই তো দেড় মাইলের ব্যবধান থাকবে, সেইজন্য আমি মাঝখান দিয়ে সোজা বেড়িয়ে যাই। লোকের কথায় কেউ চলে কি ? লোকসংজ্ঞা নাম মাত্র ও ছিল না। লোকেরা যাহাতে সুখ ভাবে, ওতে আমার সুখ চোখে পড়ে না।

রুচি, কেবল ভাল বস্ত্রের-ই

কেবল একটাই সখ ছিল, পোশাক ফার্স্ট ক্লাস পরবো। ওটা

অভ্যাস বলুন অথবা মানের জন্য। ভাল পোশাক পরার শখ ছিল, আর কিছু না। ঘর যেমনই হোক চালিয়ে নেবো।

প্রশ্নকর্তা : ছেলেবেলা থেকেই ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে।

প্রশ্নকর্তা : স্কুল যাবার সময় ও কি ভাল পোশাক ?

দাদাশ্রী : স্কুল যাবার সময় অথবা অন্য কোথাও সব জায়গাতেই ভাল থেকে ভাল চাই।

অর্থাৎ বস এতটুকুই ... শুধু পোশাকেই শক্তির ব্যয় হয়েছে। কাপড় সেলানোর সময় দর্জীকে বলতে হতো কি, 'দেখো ভাই, এই কলার এমন চাই, এরকম হতে হবে, ওরকম হতে হবে।' আর কোন জিনিসে শক্তির ব্যয় হয়নি। বিয়েতে ও শক্তি খরচ করি নি।

অনুত্তীর্ণ হয়েছি কিন্তু যোজনাপূর্বক

আমার বাবা আর বড় ভাই, দুজনে মিলে গুপ্ত মন্ত্রণা করেছিল যে, আমাদের পরিবারে একজন সুবেদার হয়েছিল, একেও মেট্রিক হয়ে গেলে সুবেদার বানাতে হবে। এই গুপ্ত মন্ত্রণা আমি শুনে নিয়েছিলাম। ওদের সুবেদার বানানোর ইচ্ছা ছিল। ওদের এই ধারণা মাটিতে মিশে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম কি এরা আমাকে সুবেদার বানাতে চায়, তো যে আমার বরিষ্ঠ সুবেদার হবে, সে আমাকে বকা-ঝকা করবে। সেইজন্য আমি সুবেদার হবো না। কেননা অনেক মুস্কিলে এই এক অবতার মিলেছে, ওখানে আবার বকাঝকা করার কেউ এসে যাবে। তাহলে এই জন্ম কি কাজের ? আমার ভোগ-বিলাসের কোন জিনিসের ইচ্ছা নেই আর সে এসে বকবে, সেটা কি করে সহ্য করা যাবে ? যার ভোগ-বিলাসের বস্তু চাই, সে বকা শুনতে পারে। আমার তো এমন কোন বস্তুর দরকার নেই। সেইজন্য আমি দৃঢ় নিশ্চয় করলাম যে পানের দোকান লাগাবো কিন্তু এমন বকা শোনার থেকে

দূরে থাকবো সেইজন্য আমি ঠিক করলাম কি মেট্রিকে অনুত্তীর্ণ হতে হবে। সেইজন্য ওতে আর কোন চেষ্টাই করি নি।

প্রশ্নকর্তা : যোজনাপূর্বক ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যোজনাপূর্বক। সেইজন্য ফেল হলাম তা ও যোজনাপূর্বক। মতলব নন মেট্রিক। আমি এটাকে সাইয়েন্টিফিক সার্কাম্স্ট্যান্সিয়েল এভিডেন্স এমন বলি, দী ওয়ার্ল্ড ইজ দী পাজল ইট-সেল্ফ, দেয়ার আর টু ভিউ পয়ন্টস ... এমন সব বলি, সেইজন্য লোকেরা প্রশ্ন করে কি, 'দাদাজী, আপনি কত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন ?' এরা তো ভাবে কি দাদাজী তো গ্রেজ্যুয়েট-এর আগে গিয়েছেন হয়তো ! আমি বলি, 'ভাই, এই কথা গুপ্ত থাকতে দিন, এটা খুললে মজা আসবে না।' এতে ওরা আগ্রহ করল, 'বলুন না, পড়াতে আপনি কত পর্যন্ত গিয়েছেন ? তখন আমি বলি, 'মেট্রিক ফেল'।

মেট্রিক ফেল হওয়াতে বড় ভাই বলল, 'তোর কিছু আসে না।' আমি বললাম, 'ব্রেন শেষ হয়ে গেছে।' এতে সে বলল, 'আগে তো খুব ভাল পারতিস না ?' আমি বললাম, 'যাই হোক এখন ব্রেন জবাব দিয়ে দিয়েছে।' তখন বলে, 'ব্যবসা দেখা-শোনা করবি ?' আমি বলি, 'ব্যবসাতে আমি কি করবো আপনি যতটুকু বলবেন ততটুকু করে যাব।' পরিণাম স্বরূপে দেড় বছর ব্যবসা করার পর বড় ভাই বলতে শুরু করলো, তুই তো আবার প্রথম নম্বরে এসেছিস !' ব্যবসাতে রুচি হয়ে গেলো, পয়সা উপার্জন করার সুযোগ মিলল।

এ তো সুবেদার হওয়ার ছিল তার বদলে উল্টো রাস্তায় চললাম। সেইজন্য ভাই বিরক্ত হয়ে চিন্তা করল কি একে ব্যবসাতে লাগিয়ে দেওয়া যাক। এতে আমি বুঝলাম কি এখন আমার গ্রহ দশা বদলে গেছে। ব্যবসাতে সব বুঝতে পারলাম, ফটাফট সব এসে গেল। আর যেমন .... হোটেলে যাওয়া, চা-জলখাবার, সবকিছু চলতে থাকে আর ব্যবসা ও কন্ট্রেক্ট-এর, খোলাখুলি একেবারে !

বিয়ের সময় ও মূর্ছিত নয়

বিয়ের সময় নতুন সাফা (পাগড়ী) পরেছিলাম, ওতে সেহরার বোঝ আসায় সাফা নিচে নেমে আসে আর নামতে-নামতে চোখের ওপর এসে যায়, ঘুরে যখন দেখি তো হীরাবা (ধর্মপত্নী) কে দেখতে পাই না। যে বিয়ে করতে এসেছে সে এমন সহজ ভাবে কনের দিকে দেখবেই তো ? জিনিস-পত্র দেখে না। কেননা তখন কন্যা দেখানোর পরম্পরা ছিল না। সেইজন্য যখন লগ্ন মন্ডপে আসে, তখনই দেখা হয়। আমার মুখের ওপর এই বড় সেহরা এসে যায়। সেইজন্য দেখা বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমার তৎক্ষনাৎ বিচার এসে গেল কি, 'এই বিয়ে তো হচ্ছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে কোন এক জনের তো বৈধব্য আসবেই। দুজনের এক জনের, দুজনের বৈধব্য আসবে না।' সেই সময় ওখানে আমার এই ভাবনা এসেছিল। আর আমাকে স্পর্শ করে যায়। কেননা চেহারা দেখতে পাই নি, সেইজন্য এই ভাবনা এসেছিল।

অ হো হো ! 'ওদেরকে' 'গেস্ট' বলতাম

আমি উনিশ বছরের ছিলাম, তখন আমার ছেলের জন্ম হয়। এর আনন্দে সমস্ত ফ্রেন্ড সার্কেলকে পেঁড়া খাওয়াই আর যখন ছেলে মারা যায় তখন ও পেঁড়া খাওয়াই। তখন সবাই বলে কি, 'কি দ্বিতীয় এসেছে ?' আমি বললাম, 'আগে পেঁড়া খান পরে বলছি কি হয়েছে।' হ্যাঁ, অন্যথা শোকে কেউ পেঁড়া খেত না, সেইজন্য আগে প্রকাশ করি নি আর পেঁড়া খাওয়াই। যখন সবাই খেয়ে নেয় তখন বলি যে, 'সেই যে অতিথি এসেছিল, সে চলে গেছে !' এতে সবাই বলে, 'এমন কেউ করে কি ? আর এই পেঁড়া খাওয়ালেন আপনি আমাদেরকে ! এটা তো বমি করতে হবে এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের !' আমি বলি, "এমন কিছু করার মতো নয়। ও অতিথি-ই ছিল। আর অতিথি আসার সময় বলে, ' আসুন, আসুন', যাবার সময় বলে 'আবার আসবেন' আর কি ঝঞ্ঝাট করবে অতিথির সাথে ?" এতে সবাই বলল, 'ওকে অতিথি

বলে? ও তো আপনার ছেলে ছিল।' আমি বললাম,'আমার জন্য তো ও অতিথি-ই ছিল।' আবার মেয়ের জন্মতেও সেইরকমই করা হলো। সবাই ভুলে যায় আর পেঁড়া খায়। মেয়ের মৃত্যুতেও পেঁড়া খায়! আমাদের লোকেরা কোথায় কিছু মনে রাখে? এদের ভুলতে কত দেরি লাগে? লোকের ভুলতে দেরি লাগে না। দেরি লাগে কি? মূর্ছিত অবস্থায় যে আছে! মূর্ছিত অবস্থা মানে কি, ভুলতে দেরি লাগে না!

তবুও বন্ধুরা মানে, 'সুপার হিউমেন'

প্রশ্নকর্তা : এখন আপনি যে সৎসঙ্গ শুরু করেছেন সেটা কত বয়সে? আপনি সবাইকে পেঁড়া খাইয়েছেন সেটাকে সৎসঙ্গ বলে?

দাদাশ্রী : না, সেটাকে সৎসঙ্গ বলে না। সেটা আমার দর্শন, এক ধরনের সূঝ (দৃষ্টি) আমার। সৎসঙ্গ মোটামুটি ১৯৪২ থেকে শুরু হয়েছে। বিয়াল্লিশ অর্থাৎ আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে (১৯৮৩ তে)। মূলতঃ সৎসঙ্গ শুরু বিয়াল্লিশ থেকে হয়েছে। আট-এ আমার জন্ম, আমার চৌত্রিশ বছর বয়েস হবে। কিন্তু অন্যথায় তো বত্রিশ বছর বয়সেই সৎসঙ্গ শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রথমে লোকেরা অল্প-অল্প কথাই শুনতে পেতো।

বাইশ বছর বয়সেই আমি বন্ধু দের বলে দিয়েছিলাম যে, 'ভাইসব, তোমরা আমার কোন কাজ কখনো করবে না।' অহংকার তো তুঙ্গেই ছিল, সেইজন্য বলি যে, 'তোমরা নিজের কাজ রাত্রে দেরি হলেও আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে।' এতে বন্ধুরা আপত্তি করে কি, এরকম কেন বলছ? আমার-তোমার করার কি দরকার?

এমন হয়েছিল কি এক জনের কাছে রাত বারোটার সময় গিয়েছিলাম। এতে সেই ভাই-এর মনে হলো কি কখনো এত রাত্রে বারোটার সময় তো আসে না আজ এসেছে, মতলব কিছু টাকা-পয়সার দরকার হবে? অর্থাৎ সে উলটা ভাব করে। তোমরা বুঝতে পারছ তো? আমার কিছু দরকার ছিল না। ওর দৃষ্টিতে ভিন্নতা চোখে পড়ে। প্রতিদিন যে দৃষ্টি থাকে সেই দৃষ্টি আজ বিগড়ে গেছে চোখে পড়লো।

এমন আমার আভাস হওয়ায় ঘরে গিয়ে বিশ্লেষণ করি। আমি অনুভব করলাম যে সংসারের মানুষের দৃষ্টি বিগড়াতে দেরি লাগে না। সেইজন্য নিজেদের সাথে যে থাকে, তাদেরকে এক এমন নির্ভয়তা প্রদান করবে যেন কোন অবস্থাতেই ওদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয় না। সেইজন্য আমি সবাইকে বলে দিই যে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ-ই আমার কোন কাজ কখনো করবে না। অর্থাৎ আমার ভয় তোমাদের মনে যেন না হয় যে এ কিছু নিতে এসেছে হয়তো।' তখন বলে, 'এমন কেন ?' আমি উত্তর দিলাম যে, 'আমি দুই হাতওয়ালাদের কাছে চাওয়ার পক্ষে নেই। কেননা দুই হাত ওয়ালারা নিজেই দুঃখী আর সে সুখ খোঁজে। আমি ওদের থেকে কোন আশা করি না। কিন্তু তোমরা আমার কাছে আশা রাখবে কেননা তোমরা তো খুঁজছো আর তোমাদের ছুট আছে। আমাকে দিয়ে তোমাদের কার্য্য বিনা দ্বিধায় করিয়ে নেবে, কিন্তু আমার কোন কার্য্য করবে না।' এমন বলে দিলাম আর ফলস্বরূপে নির্ভয় বানিয়ে দিলাম। তখন এই লোকেরা কি বলে, 'সুপার-হিউম্যান নাহলে এমন কেউ বলতে পারে না।' অর্থাৎ এরা কি বলে, এটা সুপার হিউম্যান- এর স্বভাব, হিউম্যান-এর নেচার নয়।

নিরন্তর বিচারশীল দশা

১৯২৮-এ আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ওখানে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে কি, 'আরে ! এই সিনেমা থেকে আমাদের সংস্কারের কি দশা হবে ? আর এই লোকেদের কি দশা হবে ?' পরে আবার দ্বিতীয় বিচার আসে কি, 'এই বিচারের কোন সমাধান আছে আমার কাছে ? আমার কাছে কোন ক্ষমতা আছে ? আমার কাছে তো কোন ক্ষমতা নেই, সেইজন্য এই বিচার আমার কোন কাজের না। যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে কাজে আসতো, যে বিচার ক্ষমতার বাইরে, তার পিছনে মাথা ঘামানো সেটাই ইগোইজম (অহংকার)। পরে আবার দ্বিতীয় বিচার আসে, 'কি এরকমই হবে এই হিন্দুস্থানের ?' সেই সময় জ্ঞান হয়নি, জ্ঞান তো ১৯৫৮ -এ হয়েছে। তার আগে অজ্ঞান তো ছিল কি না ? অজ্ঞান কেউ তো নিয়ে যায় নি না ? জ্ঞান ছিল না কিন্তু

অজ্ঞান তো ছিলই, তবে সেই সময় অজ্ঞানতাতেও এই সব দেখতে পাই, যে এত দ্রুত উল্টো কথা প্রচার করতে পারে, সে সিধা কথাও এত দ্রুত প্রচার করতে পারবে।' সেইজন্য সিধা কথা প্রচারের জন্যও কিন্তু এটা সর্বোত্তম। এই সব সেই সময় চিন্তা করতাম, কিন্তু ১৯৫৮ এ জ্ঞান হওয়ার পর সেই বিষয়ে আর একটুও বিচার আসে নি।

জীবনে নিয়ম-ই এই ছিল...

অর্থাৎ বাল্যকাল থেকে আমি এই শিখেছি যে, ভাই, তুমি আমার কাছে এসেছ আর তাতে তোমার যদি কোন সুখ প্রাপ্ত না হয় তাহলে তোমার আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ব্যর্থ, এমন আমি ওদেরকে বলতাম ! সে যতই অকর্মণ্য হোক, সেটা আমার দেখার দরকার নেই কিন্তু যদি তোমার আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে আর তাতে যদি আমার থেকে কোন সুগন্ধ না পাও তাহলে কি করে চলবে ? এই ধূপকাঠি অকর্মণ্যকেও সুগন্ধ দেয় কি দেয় না ?

প্রশ্নকর্তা : সবাইকে দেয়।

দাদাশ্রী : এইভাবে আমার সুগন্ধ যদি তুমি না পাও তাহলে আমার সুগন্ধ আছে বলবেই না। অর্থাৎ কিছু লাভ হতেই হবে। এমন নিয়ম আমার প্রথম থেকেই ছিল।

আমাকে রাত্রে বাইরে থেকে আসতে হয় তো আমার জুতোর আওয়াজে কুকুররা জেগে না যায় সেইজন্য আমি নিঃশব্দে পা টিপে চলতাম। কুকুরের ও তো ঘুম আছে ! এই বেচারাদের বিছানা তো, রাম তোমার মায়া ! তো এদেরকে শান্তিতে শুতেও দেবো না ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আপনার পায়ে এই কড়া কি করে পরলো ?

দাদাশ্রী : এটা তো আমি আত্মা প্রাপ্তি করার জন্য তপ করেছিলাম, তার পরিণাম। এই তপ এমন কি জুতোয় পেরেক বেরিয়ে যায় তো তাকে না ঠোকা, তেমনই চালিয়ে যাওয়া। পরে আমি বুঝতে পারলাম কি এটা তো আমি উল্টো রাস্তায় চলছি। এমন তপ আমি

করতাম। জুতোয় পেরেক বেরিয়ে আসে আর পায়ে ফুটতে থাকে সেই সময় যদি আত্মা নড়ে যায় তাহলে আত্ম প্রাপ্তি হয় নি, এমন আমার মান্যতা ছিল। সেইজন্য এই তপ হতে দিই। সেই তপের দাগ এখনো যায়নি ! তপের দাগ সারা জীবন যায় না। এটা উল্টো রাস্তা আমি বুঝতে পারলাম। তপ তো ভিতরে হওয়া দরকার।

প্রাপ্ত তপ ভোগ, অদীঠ রূপে

মুম্বাই থেকে বড়োদা গাড়িতে আসার ছিল তো বসতেই বলে দিই, 'সাত ঘন্টা একই জায়গায় বসে থাকতে হবে। তপ এসেছে !' আমি তোমাদের সাথে তো কথা বলি, কিন্তু আমার সাথেও আমার কথা চলতে থাকে যে, 'আজ তোমার প্রাপ্ত তপ এসেছে। সেইজন্য একটি কথাও বলবে না।' লোকে তো সান্ত্বনার জন্য বলে, 'দাদাজী আপনার অনুকূল হবে কি না ?' তখন বলি, 'সব ঠিক আছে।' কিন্তু আমি কাউকে কমিশন দিই না, কারণ আমাকেই ভুগতে হবে ! এক অক্ষর বললেও আমি দাদা নই। একে বলে, প্রাপ্ত তপ ভোগা।

প্রতীক্ষা করার বদলে, উপযোগ করো

যখন বাইশ বছরের ছিলাম, তখন একদিন এক জায়গায় মাত্র এক মিনিটের জন্য বাস ছুটে যায়। হালোল রোডে একটি গ্রাম আছে, ওখানে ছিলাম আর বাস এসে চলে যায়। যদিও আমি এসেছিলাম এক ঘন্টা আগে কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে এক মিনিট দেরি হয়ে যায় আর বাস বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ একে বিষাদের জায়গা বলা হয়। যদি সময়ে না আসতাম আর বাস বেরিয়ে যেত তাহলে আমি জানতাম, চলো 'লেট' হয়ে গেছি। সেই অবস্থায় এত বিষাদ হয় না। এখানে তো সময়ের আগে এসেও বাস ধরতে পারিনি ! এখন পরের বাস দেড় ঘন্টা পরে মিলবে।

এখন ওখানে যে দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো, তাতে আমার কি স্থিতি হলো ? ভিতরে মেশিন চলতে লাগলো ! তখন সেই সময়ে কত ঝঞ্ঝাট শুরু হয় ? মজদুরদের পঞ্চাশ ঝঞ্ঝাট হয় আর আমার লাখ

হয় ! কোথাও একটুও শান্তি হয় না, না তো দাড়িয়ে থাকা যায়, না কেউ, 'আসুন বসুন' বলে বসার জন্য গদ্দী পেতে দিলে সেটা ভাল লাগে। তখন দেড় ঘন্টা তো বিশ ঘন্টার সমান মনে হয়। সেইজন্য মনে মনে বললাম কি, সব থেকে বড় মূর্খতা যদি কিছু আছে তো সেটা হল প্রতীক্ষা করা। কোন মানুষের জন্য অথবা কোন বস্তুর জন্য প্রতীক্ষা করা, এর সমান ফুলিশনেস (মূর্খতা) আর কিছু নেই এই জগতে !! সেইজন্য তখন থেকে, বাইশ বছর বয়েস থেকে প্রতীক্ষা করা বন্ধ করে দিয়েছি। আর যখন প্রতীক্ষা করতেই হয় তখন সেই সময় অন্য কোন কাজ দিয়ে দিই , প্রতীক্ষা তো করতেই হয়, ওর থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন রাস্তাই নেই না ! তার তুলনায় আমি জানলাম এই প্রতীক্ষা করার সময় খুব সুন্দর। অন্যথা শুধু এদিকে-ওদিকে উঁকি দেয় যে বাস আসলো কি আসে নি ! সেইজন্য এমন সময়ে আমি অন্য ব্যবস্থা করে নিই। তার পর ভিতরে শান্তি থাকে ! আমাদের দ্বারা কোন ব্যবস্থা করা যায় কি করা যায় না ?

প্রশ্নকর্তা : করা যায়।

দাদাশ্রী : কাজ তো অনেক হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ মন কে কাজে লাগিয়ে দেন।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মনকে কাজে লাগিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তা : কি কাজে লাগাতেন ?

দাদাশ্রী : যে কোন ধরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ! অর্থাৎ সে সময় আমি কি করতাম ? কোন সন্ত অথবা কৃপালুদেবের কোন রচনা আমি বলতাম না, পড়তাম । বললে সেটাকে মুখস্থ বলা বলে। ওটা আমি সম্পূর্ণ পড়তাম। এই কথা তুমি বুঝতে পারছ তো ?

প্রশ্নকর্তা : ওটা কেমন করে পড়তেন, দাদাজী ? পুস্তক ছাড়া কিভাবে পড়তেন ?

দাদাশ্রী : পুস্তক ছাড়াই পড়তাম। আমি তো 'হে প্রভু', অক্ষর লেখা দেখতে পাই আর আমি পড়তে থাকি। অন্যথায় মন তো মুখস্থ বলবে আর পরে সব সংকল্প-বিকল্প চলবে! আর যখন মুখস্থ বলবে তখন মন বেকার হয়ে যাবে। 'হে প্রভু, হে প্র ভু' বলতে থাকবে আর মন বেকার বসে থেকে বাইরে চলে যাবে। সেইজন্য আমি এডজাস্টমেন্ট নিয়েছিলাম। যেন যেমন লেখা আছে, তেমন দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন :- "হে প্রভু, হে প্রভু কি করি, দীননাথ দয়াল,

আমি তো দোষ অনন্তের, ভাজন করুণাল!"

এই প্রত্যেক শব্দ, অক্ষর মাত্রা-বিন্দির সাথে সব দেখতে পাই! কৃপালুদেব আরো একটা রাস্তা বলেছিল, যে উল্টো দিক থেকে পড়া। শেষ থেকে প্রথম পর্যন্ত আসা। তখন লোকের এর প্রেকটিস ও হয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে যায়। মনের স্বভাব-ই এমন তুমি যেমন ছাঁচে ঢালবে, তেমনই হয়ে যায়, মুখস্থ করে নেবে। আর এটা পড়া মুখস্থ নয়, চোখে দেখতে হবে। এইজন্য এটা আমার সব থেকে বড় আবিষ্কার, পড়ার জন্য। আর তখন আমি অন্যকেও শেখাই। এদের সবাই কে শিখিয়েছি পড়ে বলা।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদাজী, বাইশ বছর বয়সে এই শক্তি ছিল কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, বাইশ বছর বয়সে এই শক্তি ছিল।

সমস্যা তে বিকশিত অন্তর বোধ

অর্থাৎ আমার এই সমস্যার জন্য এই জ্ঞান প্রকট হয়েছে। দেড় ঘন্টার এই সমস্যা না হলে ....

প্রশ্নকর্তা : এক মিনিট ও দেরি না হতো....

দাদাশ্রী : সেই এক মিনিটের জন্য ছুটে যায়, ফল স্বরূপে এই জ্ঞান উৎপন্ন হলো। মানে ঠোকর খেতে-খেতে এই জ্ঞান উৎপন্ন হলো, বোধ উৎপন্ন হলো। যখন ঠোকর লাগে তখন বোধ উৎপন্ন হয়। আর আমি কারো রাস্তা দেখিনি। বাইশ বছরের পর আমি কারো রাস্তা দেখিনি। গাড়ি আজ সাড়ে তিন ঘন্টা 'লেট' মানে আমি টাইম (সময়) অপব্যয় করবো না আর আমি উপযোগিতায় থাকবো।

এমন ব্যবস্থা করেছি কাউন্টার পুলির

এখন অপেক্ষা করা আর তার উপর অপ্রতিরোধ্য 'রেভলিউশন' (মনের চিন্তা করার গতি শক্তি) !

এই মজদুরদের প্রতি মিনিট পঞ্চাশ 'রেভলিউশন' হয়, যখন কি আমার প্রতি মিনিট এক লাখ রেভলিউশন হয়। অর্থাৎ আমার আর মজদুরদের মধ্যে অন্তর কত ? ওদের পঞ্চাশ রেভলিউশন হওয়ার জন্য যখন তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলবে তো ওদের বুঝতে অনেক দেরি লাগবে। তুমি সাধারন কথা, ব্যবহারের সহজ কথা বললে সেটাও ওদের বোধ-এ আসবে না। সেইজন্য তুমি যদি আবার ওদেরকে আলাদা ভাবে বোঝাও তবে ওরা বুঝতে পারবে। এখন আমার রেভলিউশন বেশী হওয়াতে আমার কথা এই উঁচু জাতের লোকদের বুঝতে দেরি লাগে। আমার বোঝানোর পরও এরা বুঝতে পারে না। সেইজন্য আমি বলতাম যে, 'এরা অযোগ্য, নির্বোধ।' এরজন্য ভিতরে পাওয়ার অনেক বেড়ে যেতো। 'এতো বোঝানোর পরও বুঝতে পারছে না ! কেমন মূর্খ লোক !' এরকম বলে ওদের উপর ক্রোধ করে বসতাম। পরে বুঝতে পারলাম এটা রেভলিউশন-এর জন্য হচ্ছে , যার জন্য ওদের মাথায় ঢুকছে না। এখন আমি যদি ওদের দোষ বলি তো সেটা আমার দোষ হবে। সেইজন্য আমি পুলি দেওয়া শুরু করি।

যদি পনেরশো রেভলিউশন-এর পাম্প, তিন হাজারের ইঞ্জিনের সাথে চালাও তো পাম্প ভেঙ্গে যাবে। এর জন্য পুলি দিতে হবে, কাউন্টার পুলি। ইঞ্জিন যদি তিন হাজারের আর পাম্প পনেরশোর

তাহলে মাঝে পুলি দিতে হবে যাতে পাম্প পর্যন্ত পনেরশো-ই পৌছায়। কাউন্টার পুলি তুমি বুঝতে পারছ তো ? সেই রকম আমি লোকের সাথে কথা বলার সময় কাউন্টার পুলি দিতে শুরু করি। তারপর আমার ক্রোধ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সামনের জন বুঝতে পারে, সেই ভাবে কাউন্টার পুলি দিতে হয়।

3) অহংকার –মান বিপরীত জাগৃতি নিবাসস্থান, কিন্তু বিচারপূর্বক

বণিক প্রকৃতির একটু ক্ষত্রিয়র সঙ্গে মিলালে আর ক্ষত্রিয়র একটু বণিক এর সঙ্গে মিলালে যে মিক্সার হবে সেটা খুব ভাল হবে। দই যদি টক-মিষ্টি হয় তাহলে শ্রীখন্ড মজাদার হয়। সেইজন্য আমি প্রথম থেকেই কি করেছি ? প্রথমে আমরা প্যাটেল দের পাড়ায় থাকতাম। আমার বড় ভাই-এর ব্যবহার প্যাটেলদের সাথে ছিল। কিন্তু ওই ব্যবহার আমার পছন্দ ছিল না। আমি ছোট ছিলাম কিন্তু প্যাটেলদের সাথে থাকা আমার পছন্দ ছিল না। কেন পছন্দ হতো না ? কেননা যদিও আমার বয়স বাইশ ছিল, তবুও আমি মুম্বাই শুধু বেড়ানোর জন্য যেতাম আর ফেরার সময় মুম্বাইয়ের হালুয়া, যেটা সস্তা দামে পাওয়া যেতো, তা নিয়ে আসতাম। যা আমার বৌদি পাড়া-প্রতিবেশীদের বিতরণ করতো। এরকম এক-দুই বার নিয়ে গেছি কিন্তু এক বার নিয়ে যেতে ভুলে যাই। এতে সমস্ত প্রতিবেশী, যার সঙ্গে বৌদির দেখা হতো, বলে, 'এবার হালুয়া নিয়ে আসে নি ? আমার মনে হলো, 'এই পীড়া যা ছিল না কোথা থেকে এলো ?" আগে এই পীড়া ছিল না। কেউ 'নিয়ে আসি নি' বলে অপমানিত করে নি। এনেছি সেটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। এক বার এনেছি, দ্বিতীয় বার এনেছি, তৃতীয় বার আনি নি তো তামাশা হয়ে গেছে। 'দেখুন, এবার নিয়ে আসে নি ? এখন আমি ফেঁসে গেছি। অর্থাৎ এদের সাথে ব্যবহার করার যোগ্য নয়। আর এই ক্ষত্রিয়, এদের সমস্ত ব্যবহার কেমন হয় ? এরা বলবে যে যদি দরকার হয় তো

আমার মাথা নিয়ে নেবেন কিন্তু আপনিও আমাকে দিতে হবে। মাথা নেওয়া-দেওয়ার তৈয়ারি। এদের সওদা কেমন ? বড়ই হবে ! সাট্টার অনেক বড় বিজনেস, মাথাই কেটে নেওয়া-দেওয়া। সেইজন্য আমার এই মাথার লেন-দেন পোষায় নি। আমি কারো মাথা চাই না আর এ আমার মাথা নিতে এসেছে। এমন সওদায় তো আমি পরতেই চাই না, সেইজন্য ঠিক করলাম বণিক দের সাথে থাকা যাক।

কারণ কি এক জন মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি রাবণের রাজ্য কেন চলে যায় ? তখন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন চলে যায় ? আমাকে একটু বোঝান না !' এতে সে বলল যে, 'যদি সেক্রেটরী- দেওয়ান হিসাবে একজন বেনিয়া কে রাখতো তাহলে ওকে রাজ্য হারাতে হতো না !' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিভাবে হারাতো না ?' তখন সে বললো যে, নারদ যখন সীতার বিষয়ে বলেছিল যে সীতা অত্যন্ত রূপবতী, এমন, তেমন । যে সময় রাবণের মনকে উসকিয়েছিল, যে কোন উপায়ে সীতাকে প্রাপ্ত করতে হবে। সেই সময় যদি বণিক ওর দেওয়ান হতো তাহলে সে বোঝাতো যে, 'মহাশয়, একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি অন্য একজন অতি উত্তম স্ত্রী দেখেছি ।' অর্থাৎ রাবণ কে ঠিক সময়ে দূর করে দিতো আর একবার সুযোগ হাত থেকে বেরিয়ে গেলে একশো বছর পার হয়ে যাবে। এমন কথা সেই লোকটা আমাকে বলেছিল। আমি ভাবলাম কথাটা তো বুদ্ধিমানের মতো। সুযোগের সুবিধা নেবার জন্য এমন কাউকে চাই ! সেইজন্য এই বণিকদের সাথ, আমাদের দুদিকেই প্রতিবেশী বণিক, ওদের সাথে চল্লিশ বছর ধরে আছি !

আমি বাড়িতে বলে দিয়েছিলাম যে এখানে কেউ কিছু নিতে আসে তাহলে অবশ্য দেবে। পরে ফিরিয়ে দিলে নিয়ে নেবে, কিন্তু কখনো চাইবে না । একবার দেবে, আবার দিতে হয় দেবে, তৃতীয় বার দিতে হয়, এমন একশো বার যদিও দিতে হয় তো দেবে কিন্তু ফিরিয়ে

দিতে বলবে না। ফিরিয়ে দিলে নিয়ে নেবে। এই বণিক দের ব্যবহার এমন সুন্দর যে ওদের ওখানে হালুয়ার গোটা টুকরো পাঠানো হয় প্রথমে আর যদি দ্বিতীয় বার আধা টুকরো অথবা এক চতুর্থাংশ পাঠালেও কোন হই-চই করে না। আর কখনো একা-আধ বার না পাঠালেও কোন হাল্লা-গোল্লা হয় না। ওদের সঙ্গ আমার পোষাবে। আমার চিৎকার-চেচামেচি করাদের সঙ্গে কি করে পোষাবে ?

তার পর আমি এক মেহতাজীকে চাকরিতে রেখেছিলাম। এক ভাই আমাকে বলতে আসে কি আপনার বণিক খুব পছন্দ, তো এই বণিক কে চাকরিতে রাখবেন কি ? তখন আমি বললাম, এসে যাও কারখানায়, এত লোক কাজ করছে আর তুমি তো বণিক তাহলে ভালই হবে ! এভাবে সব সময় সাথে বণিক রাখতাম।

এই সব মানের জন্য

সব সময় চার-চারটি গাড়ি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মামানী পোল (দাদাজীর বাড়ির পাড়ার নাম)। সভ্য পাড়া। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লোক বাংলোতে থাকতো কি ? বড়োদায় মামানী পোল খুব সম্ভ্রান্ত যায়গা ছিল। সেইসময় আমি এই মামানী পোলে থাকতাম আর ঘর ভাড়া পনের টাকা মাসিক ছিল। সেই সময় লোকেরা সাত টাকা ভাড়ার ঘরে পড়ে থাকতো। আমাকে বড় কন্ট্রাকটর বলতো। ওখানে মামানী পোলে বাংলোতে থাকা লোকেরা গাড়ি নিয়ে আমার কাছে আসতো। কারণ এরা কোন সংকটে হতো। উল্টা-সিধা কাজ করে এখানে আসতো, তবুও ওদেরকে 'পিছনের দরজা' দিয়ে বের করে দিতাম। (নিজের বুদ্ধি দিয়ে সংকট থেকে বেড়োবার রাস্তা দেখাতাম)। পিছনের দরজা দেখাতাম যে এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। এখন দোষ ও করেছে আর পিছনের দরজা দিয়ে আমি ছাড়াতাম। অর্থাৎ দোষ নিজের উপর নিলাম। কিসের জন্য ? সেই মানের জন্য। 'পিছনের দরজা' দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া দোষের নয়

কি ? এমন বুদ্ধি খাটিয়ে রাস্তা দেখাতাম, সেইজন্য ওরা বেচে যেত। সেইজন্য ওরা আমাকে সম্মান করতো, কিন্তু দোষ আমার উপরে আসতো। পরে বুঝতে পারলাম অভানাবস্থায় এই সবই দোষের হয়, মানের জন্য। তখন মান ধরা পরলো। মানের জন্যই চিন্তা হতো ।

প্রশ্নকর্তা : মানকে আপনি ধরতে পারলেন, তার পর মানকে কেমন করে মারলেন ?

দাদাশ্রী : মান মরে না। মানকে এই ভাবে উপশম করেছি। বাকি, মান মরে না। কারণ মারনেওবালা যদি নিজেই হয় তাহলে কে কাকে মারবে ? নিজেই নিজেকে মারবে কি করে ? তুমি বুঝতে পারছো তো ? সেইজন্য উপশম করে যেমন তেমন করে দিন কাটিয়েছি।

এই অহংকার দংশন করতো দিন-রাত

আমার বুদ্ধি একটু বেশী লাফালাফি করতো আর অহংকারের লাফালাফিও বেশী ছিল। আমার বড় ভাই খুব অহংকারী ছিল, সবার মাঝে মনে হতো পার্সনেলিটিওয়ালা, ওনাকে দেখতেই একশো লোক এদিক-ওদিক হয়ে যেত। কেবল চোখের পার্সনেলিটি-ই এমন ছিল ! চোখ আর চেহারার প্রভাবই এমন ছিল !! আমি দেখলেই বলতাম, 'আমার তো ওনাকে ভয় লাগে।' তবুও সে আমাকে কি বলতো ! 'আমি তোর মতো অহংকারী আর কাউকে দেখি নি !' আরে আমি তো আপনার থেকে ভড়কে যাই। তবুও সে একলা হলে বলতো, আমি তোর মতো অহংকার আর কোথাও দেখি নি ! আর বাস্তবে এই অহংকার পরে আমার দৃষ্টিতে আসে। এই অহংকার যখন আমাকে দংশন করে তখন আমি জানতে পারলাম যে বড় ভাই যা বলতো, এ সব সেই অহংকার ! 'আমার আর কিছু চাই না' মানে লোভ নাম মাত্র নেই এমন অহংকার ! একটা চুলের সমান ও লোভ নেই। এখন সেইজন্য

এই মান কেমন হবে ? যদি মান আর লোভ বিভাজন হয়ে যেত তাহলে মান একটু কম-ই হতো ....

মন থেকে মানা মান

মন তো এমন মানে যেন এই জগতে আমি যেমন, তেমন আর কেউ নেই। দেখুন, নিজেকে না জানি কি ভেবে বসে ছিলাম ! মলিকানাতে কিছু নেই। দশ বিঘা জমি আর একটা ঘর, এ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু মনে দাপট কেমন ? যেন চরোতরের রাজা ! কেননা আশপাশের ছয় গ্রামের লোকেরা আমাকে পথভ্রান্ত করেছিল। পনের বর, যত চাইবে, পন তত পাবে তবে বিয়েতে রাজি হবে। এমন মগজে নেশা ভরা ছিল। কিছু পূর্বভব থেকে এনেছিলাম, সেইজন্য এমন সব নেশা ভরা ছিল।

ওতেও আমার বড় ভাই তো জবরদস্ত মত্ততা রাখতো। আমার বড় ভাইকে আমি 'মানী' বলতাম। তখন সে আমাকে মানী বলতো। একদিন সে আমাকে কি বললো ? "তোর মত 'মানী' আমি দেখি নি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় আপনি আমার মান দেখতে পেলেন ?' তখন বললো, 'সব কথাতেই তোর মান হয়।'

আর তার পর আমি খুঁজলাম, তাতে প্রত্যেক কথাতেই আমার মান নজরে এলো আর সেই আমাকে দংশন করতে থাকে। এই মানের জন্য কি করলাম ? যে কেউ হোক, সবাই 'অম্বালালভাই, অম্বালালভাই' বলে ডাকে ! অম্বালাল তো কেউ বলতোই না ! ছয় অক্ষরে ডাকে, সেইজন্য এর অভ্যাস হয়ে যায়, এর হেবিচ্যুয়েট হয়ে যায়। এখন মান যখন এত বড় তো ওর রক্ষা ও করতে হবে ! সেইজন্য আবার যদি কেউ ভুল করে তাড়াতাড়িতে 'অম্বালালভাই' বলতে পারে না আর 'অম্বালাল' বলে ডাকে তো এটা কি ওর ভুল ? ছয় অক্ষর এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি কি করে বলবে কেউ ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি কি এমন আশা করতেন ?

দাদাশ্রী : আরে, আমার তো আবার হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায় কি 'এ আমাকে অম্বালাল বললো ? নিজেকে কি মনে করে ? ওর দ্বারা কি অম্বালালভাই বলা যায় না ?' গ্রামে দশ-বার বিঘা জমি আর দাপট দেখানোর কিছু না হোক তবু ও মনে না জানি নিজে নিজেকে কি ভেবে বসেছিলাম। 'আমি ছয় গ্রামের, প্যাটেল, পনওয়ালা।'

যখন কেউ 'অম্বালাল্‌ভাই' না বলে, তখন আমার সারা রাত ঘুম নষ্ট হয়ে যায়, ব্যাকুলতা হয়। দেখ !! ওতে কি প্রাপ্ত হবার ছিল ? ওতে মুখ কিছু মিষ্টি হয় কি ? মানুষের কেমন স্বার্থ হয় ! এমন স্বার্থ, যেখানে কোন স্বাদ ও আসে না। তবুও মেনে নিয়েছিলাম, যেটা লোকসংজ্ঞার মান্যতা ! লোকেরা বড় বানিয়েছে আর লোকেরাই শ্রেষ্ঠত্বর মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু এমন লোকের মান্যতা কি কাজের ?

এই গরু-মোষ সব আমার দিকে দেখে, সব গরুরা আমাকে দেখতে থাকে আর কান নাড়ে তাহলে কি এটা মনে করব যে এরা আমাকে সম্মান করছে ? এই সব তারই সমান। আমরা আমাদের মনে মেনে নিই যে এই লোকেরা সব সন্মানে দেখছে, মনের মান্যতা ! এরা তো সবাই নিজের নিজের দুঃখে ডুবে আছে বেচারারা, নিজের নিজের চিন্তায় আছে। এরা কি তোমার জন্য বসে আছে, কাজ-কর্ম ছেড়ে ? নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।

পছন্দের অহংকার দুঃখদায়ী হল

সেই সময় আশপাশের লোকেরা কি বলতো ? খুব সুখী মানুষ ! কন্ট্রেক্ট-এর ব্যবসায়, পয়সা আসছে-যাচ্ছে। মানুষ কে ভালবাসে। মানুষ ও প্রেমদৃষ্টি স্বীকার করে যেন ভগবানের মত মানুষ, খুব সুখী মানুষ ! লোকেরা বলে খুব সুখী মানুষ কিন্তু আমি চিন্তা অনেক করতাম।

এক দিন ঘুমই আসছিল না, চিন্তা যাচ্ছিল না। আমি বসে

গেলাম আর একটি পুড়িয়া বানালাম, তাতে সব চিন্তা রাখলাম। এইভাবে মুড়লাম, সেইভাবে মুড়লাম আর তার পর বিধি করলাম আর বালিশের নিচে রেখে শুয়ে পরলাম, তখন ভাল ভাবে ঘুম এসে গেল। আর তারপর সকালে উঠে সেই পুড়িয়াটা বিশ্বামিত্রী নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। তারপর চিন্তা কম হয়ে যায়। কিন্তু যখন 'জ্ঞান' হয় তখন সারা সংসার কে দেখি আর জানি।

প্রশ্নকর্তা : কিন্ত 'জ্ঞান' এর আগে এই জাগৃতি তো ছিল, যে এটা অহংকার, এমন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই জাগৃতি তো ছিল। অহংকার সেটাও জানতাম, কিন্তু, এটা আমার পছন্দ ছিল। আবার যখন খুব দংশন হতো তখন বুঝতে পারলাম কি এ আমার বন্ধু হতে পারে না, এ তো আমার বৈরী, এসব কিছুতে মজা নেই।

প্রশ্নকর্তা : এই অহংকার কে কবে থেকে বৈরী মনে হলো ?

দাদাশ্রী : রাতে ঘুম আসতে দেয় না, সেইজন্য বুঝে গেলাম কি এটা কি ধরনের অহংকার। সেইজন্য তো এক রাত্রে পুড়িয়া বানিয়ে সকালে গিয়ে বিশ্বামিত্রীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আর কি করতাম ?

প্রশ্নকর্তা : মানে পুড়িয়াতে কি রেখেছিলেন ?

দাদাশ্রী : সমস্ত অহংকার ! এই সব চাই না। কার জন্য এইসব ? বিনা কারণে, না নেবার, না দেবার ! লোকে বলে কি, 'অসীম সুখী' আর আমার তো সুখের ছিটা-ফোটাও নজর আসে না, ভিতরে অহংকারের অসীম চিন্তা- হয়রানি হয়।

এই অহংকার কবে ছাড়ল ?

প্রশ্নকর্তা : সেই অহংকারকে ছাড়ার ইচ্ছা কবে হলো ? সেই পাগল অহংকার আপনি কবে ছেড়ে দিলেন ?

দাদাশ্রী : সে ছেড়ে দিলে ছাড়ে না, অহংকার ছাড়ে কখনো ? এ তো সুরাট স্টেশনে জ্ঞান প্রকট হল আর নিজে নিজেই ছেড়ে গেল। বাকি, ছেড়ে দিলে ছাড়ে না । ছাড়নেওয়ালা কে ? অহংকারের রাজ্যে ছাড়নেওয়ালা কে ? যেখানে রাজাই অহংকার, তাকে কে ছাড়বে ?

সেদিন থেকে 'আমি' আলাদা-ই স্বরূপে

প্রশ্নকর্তা : আপনার যে জ্ঞান লব্ধি হয়েছে সেই প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনা করুন ! সেই সময় আপনার কেমন লেগেছে ?

দাদাশ্রী : আমার মনে কোন বিশেষ ভাব ছিল না। আমি তো, ওদিকে তাপ্তি রেলওয়ে লাইনে সোঁনগড়-ভ্যারা নামের জায়গা আছে, ওখানে আমার বিজনেস আছে, ওখান থেকে ফিরে সুরাট স্টেশনে এসেছিলাম। তখন এক ভাই সব সময় আমার সাথে থাকতো। সেই সময় আমি সূর্য্যনারায়ণ অস্ত হওয়ার আগে ভোজন করতাম, সেইজন্য ট্রেনেই ভোজন করে নিয়েছিলাম আর সুরাট স্টেশনে ছয়টার সময় ট্রেন থেকে নেমেছিলাম। সেই সময় সঙ্গের ভাই , খাওয়ার বাসন ধোয়ার জন্য গিয়েছিল আর আমি রেলওয়ের বেঞ্চে একলা বসে ছিলাম। সেই সময় আমার এই 'জ্ঞান' উৎপন্ন হয়ে গেলো কি জগত কি আর কিভাবে চলছে ? কে চালাচ্ছে আর এসব সব কিভাবে চলছে ? এই সমস্ত হিসাব সামনে এসে গেল। সেইজন্য সেদিন আমার ইগোয়িজম (অহংকার) আর সব কিছু সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর আমি অন্য স্বরূপে থাকতে শুরু করি। উইদাউট ইগোয়িজম আর উইদাউট মমতা (বিনা অহংকার আর বিনা মমতা) ! প্যাটেল সেই রকম, আগের মতই ছিল, কিন্তু 'আমি' আলাদা স্বরূপে হয়ে গিয়েছিলাম !! তখন থেকে নিরন্তর সমাধি ছাড়া, এক সেকেন্ড-এর জন্য ও অন্য কিছুতে থাকিনি !

সুরাট স্টেশনে কি দেখতে পান ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, যখন আপনার সুরাট স্টেশনে জ্ঞান হয়, তখন কেমন অনুভব হয়েছিল ?

দাদাশ্রী : সমস্ত ব্রহ্মান্ড দেখতে পাই ! এই জগৎ কিভাবে চলছে, কে চালাচ্ছে, সব দেখতে পাই। ঈশ্বর কি, আমি কে, এ কে, এসব কিসের আধারে এসে মিলে, এই সব দেখতে পাই। তখন বুঝতে পারলাম আর পরমানন্দ হয়ে গেল। তার পর সমস্ত রহস্য খুলে গেল ! শাস্ত্রে পূর্ণ রূপে লেখা থাকে না। শাস্ত্রে তো যেখান পর্যন্ত শব্দ পৌঁছায় সেখান পর্যন্ত লেখা হয় আর জগৎ শব্দ থেকে অনেক আগে।

ভীড়ে একান্ত আর প্রকট হয় ভগবান

প্রশ্নকর্তা : সুরাটের স্টেশনে যে অনুভূতি হয়েছে, যে একেবারে ডাইরেক্ট প্রকাশ হলো, সেটা নিজে নিজে অনায়াসে হয়েছে কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অনায়াসেই, নিজে নিজেই উৎপন্ন হয়েছে। সুরাটের স্টেশনে একটা বেঞ্চে বসে ছিলাম, অনেক ভিড় ছিল, কিন্তু এটা অনায়াসেই উৎপন্ন হয়ে যায় !

প্রশ্নকর্তা : তারপর ?

দাদাশ্রী : পরে সমস্ত কিছু পূর্ণ রূপে দেখতে পাই, তার পর সব কিছু বদলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : সেই সময় দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তো সেখানেই যেমন তেমনই ছিল কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তারপর তো মানুষের পেকিং দেখা শুরু হয় আর পেকিং –এর ভিতরের মাল ও দেখতে পাই। ভেরাইটিজ অফ পেকিং আর মাল একই রকম ! অর্থাৎ সেই সময় সমস্ত সংসার অন্য রকম দেখতে পাই ওখানে !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানের পর ব্যবহারিক কার্য্য হ্তো কি ?

দাদাশ্রী : খুব ভাল হতো। আগে তো অহংকার ব্যবহার কে কলুষিত করতো ।

প্রশ্নকর্তা : পদে (গানে) যে 'ভিড়ে একান্ত আর কোলাহলে শুক্ল ধ্যান ' লেখা হয়েছে তার একটু বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ?

দাদাশ্রী : 'ভিড়ে একান্ত' মানে কি যে মানুষ একান্তে একান্ত রূপে থাকতে পারে না, কারণ কি মন আছে তো ? সেইজন্য যেখানে ভিড় সেখানে একান্ত ! আবার 'কোলাহলে শুক্লধ্যান' উৎপন্ন হয়েছে। আশপাশে এত কোলাহল ছিল যে কি বলবো ! লোকের এত ভিড় আর আমি আমার শুক্লধ্যান-এ ছিলাম। অর্থাৎ সমস্ত সংসার আমি জ্ঞানে দেখতে পাই। যেমন আছে তেমনই দেখতে পাই !

প্রশ্নকর্তা : এমন অবস্থা কতক্ষণ ছিল ?

দাদাশ্রী : একই ঘন্টা ! এক ঘন্টায় তো সব কিছু একজেক্ট এসে গেল। তার পর তো সব কিছু অদল বদল হয়ে গেল দেখলাম। অহংকার গোড়া থেকে চলে গেল। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, এইসব কমজোরি চলে গেল। আমি তো এমন আশা রাখিই নি !

লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি, 'আপনার এই জ্ঞান কেমন করে হলো ?' আমি বলি, তোমরা নকল করতে চাইছ তো এটা নকল হবার নয়। দিস ইজ বাট নেচারেল (এটা সহজ প্রাকৃতিক)। যদি এটা নকল করার মতো হতো তাহলে আমিই বলে দিতাম ভাই, আমি এই রাস্তায় গিয়েছি, এদিকে গিয়েছি, ওদিকে গিয়েছি, সেইজন্য আমার এটা প্রাপ্ত হয়েছে। আর আমি যে রাস্তায় গিয়েছিলাম, সেই রাস্তায় এত বড় পুরস্কার পাওয়া সম্ভবই ছিল না। আমি তো সাধারন ফাইভ পারসেন্ট (পাঁচ প্রতিশত) আশা রেখেছিলাম। ফাইভ পারসেন্ট না, এক পারসেন্টের আশা রেখেছিলাম, কি আমার মেহনত যদি ফলে তো আমাকে এর মধ্যে এক-আধ পারসেন্টে মিলে যাবে।'

তারিখের আকাঙ্ক্ষা নেই

প্রশ্নকর্তা : দাদা, আপনার জ্ঞান হয়েছে সেটা কোন তারিখ

ছিল ?

দাদাশ্রী : সেই সাল তো আটান্ন (১৯৫৮) ছিল। কিন্তু তারিখ তো, আমি কি জানতাম যে এটা লিখে রাখার দরকার আছে! আর কেউ কখনো লেখা চাইবে সেটাও জানতাম না তো! আমি তো জানি যে এখন আমার সমাধান এসে গেছে!

প্রশ্নকর্তা : এটা চেষ্টা করে খুঁজে তো বের করতে হবে!

দাদাশ্রী : না, না, এটা তো যদি তারিখ মেলার হয় তো মিলে যাবে! এখন আমরা কেন ঝঞ্ঝাটে পড়ি ?!

প্রশ্নকর্তা : সেই সময় কি বর্ষা কাল ছিল ?

দাদাশ্রী : না, সেই সময় বর্ষা আর গরমের মাঝামাঝি সময় ছিল।

প্রশ্নকর্তা : জুলাই মাস ছিল কি ?

দাদাশ্রী : ওটা জুলাই না, জুন ছিল। ওতে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, আমার তো প্রকাশ হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ পরে জানার জন্য আগ্রহী হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : উৎসুক হলে তখন সামনে আসতে পারে! দরকার হলে বেরিয়ে আসবে!

এভাবে করবে প্রতিক্রমণ

আরে, সেই সময় অজ্ঞান অবস্থায় আমার অহংকার ভারী ছিল! 'অমুক এমন, অমুক তেমন' শুধু তিরস্কার, তিরস্কার, তিরস্কার, তিরস্কার, ...আর কখনো কাউকে প্রশংসা ও করেছি। এদিকে এক জনকে প্রশংসা করি তো ওদিকে কাউকে তিরস্কার। আর যখন ১৯৫৮ এ জ্ঞান প্রকট হয়েছে তখন থেকে এ. এম. প্যাটেল কে বলে দিয়েছি কি যাকে যাকে তিরস্কার করেছ, সেই লোকদের খুঁজে বের করে, সেই

তিরস্কার কে সাবান দিয়ে পরিস্কার করে ফেলো, সেইজন্য সবাইকে খুঁজে এক এক করে পরিস্কার করে যাচ্ছি। এদিকের প্রতিবেশী, ওদিকের প্রতিবেশী, সমস্ত পরিবারের লোকজন, কাকা, মামা, সবাই, যাদের সাথে বিনা কারণে তিরস্কার হয়েছে! সেই সব ধুয়ে ফেলেছি।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ মন থেকে প্রতিক্রমণ করেছেন, সামনে প্রত্যক্ষ নয় ?

দাদাশ্রী : আমি এ. এম. প্যাটেল কে বলি কি তুমি যা যা উল্টো কাজ করেছ সেই সমস্ত আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন তো এই সমস্ত উল্টো করাকে পরিস্কার করে ফেলো! এইজন্য তাকে কি করতে হয়েছে? কিভাবে পরিস্কার করবে? আমি তখন তাকে বোঝালাম যে সেইসব মনে করো। চন্দুভাইকে গালি দিয়েছ আর সারা জীবন ভালো-মন্দ বলেছ, তিরস্কার করেছ, এই সব বর্ণনা করে বলবে যে, 'হে চন্দুভাই, মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নৌকর্ম থেকে ভিন্ন, প্রকট শুদ্ধাত্মা ভগবান! চন্দুভাই এর ভিতরে স্থিত শুদ্ধাত্মা ভগবান! আমি চন্দুভাই এর কাছে বার বার ক্ষমা চাইছি, সেই দাদা ভগবানের সাক্ষীতে ক্ষমা চাইছি, আর আবার এমন দোষ করবো না।' যদি তুমি এমন কর তখন তুমি সামনের জনের চেহারার পরিবর্তন দেখবে। ওর চেহারার বদল চোখে পড়বে। তুমি এখানে প্রতিক্রমণ করবে আর ওখানে পরিবর্তন হবে।

এই জ্ঞান প্রকটের পর...

এই সমস্ত সাইয়েন্টিফিক্ সারকাম্স্ট্যান্শ্যল্ এভিডেন্সেস, সংযোগ একত্র হয় আর সুরাট স্টেশনে কাল (সময়) ও মিলে যায়। সেই কালে এই জ্ঞান প্রকট হয়ে যায়, যে জগৎ কিসের আধারে চলছে, কিভাবে চলছে এই সব, সমস্ত বিজ্ঞান দেখতে পাই, বাইরের চোখ দিয়ে নয়, ভিতরের চোখ দিয়ে। বস সেই ক্ষণ থেকে অহংকার সম্পূর্ণ চলে

গেল ! 'আমি দেহ' এই সমস্ত উড়ে যায় !! পূর্ণ জ্ঞান দশা তৎক্ষণ থেকে !!!

এখন এখানে বড়োদায় জ্ঞান দশাতে আছি,! ফ্রেন্ড সার্কেল এখানে আসা-যাওয়া করে, আগের মূল কর্মের জন্য ! আগের সমস্ত লোকের সঙ্গে, 'তুমি কেমন আছো? কি হয়েছে ? কি নয়', এসব চলতে থাকে। কিন্তু আগে যে মমতা হতো তা এখন নেই। আগে মানের পোষণের জন্য আমি বলতাম। কারো কোন কাজ আমি বিনামূল্যে করতাম না, তার বদলে আমার মানের পোষণ হতো, এইজন্য ! অর্থাৎ বিনা মূল্যে কোন কাজ হয়ই না। কিন্তু এখন সেই কাজ মানের অপেক্ষা বিনা হয়ে যায়।

জ্ঞান প্রকট হওয়ার পর চার বছর কেটে যায়। তখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি যে আমার কিছু প্রাপ্ত হয়েছে। তার পর ভিড় জমতে শুরু করল।

(৪) অংশীদারীতে ব্যবসা করেছি....

চাকরির সমান ঘর খরচের জন্য

আমি ছোট বেলায় ঠিক করেছিলাম কি যত দুর সম্ভব অসৎ এর লক্ষ্মী (টাকা-পয়সা) নেব না, আর যদি সংযোগাধীন এসে যায় তো তাকে ব্যবসাতেই থাকতে দেব ঘরে ঢুকতে দেব না। সেইজন্য আজ আমার ছিষট্টি বছর হয়ে গেছে কিন্তু অসৎ-এর লক্ষ্মীকে ঘরে ঢুকতে দিই নি আর ঘরে কোন ক্লেশ হয় নি। ঘরে ঠিক করেছিলাম কি এত টাকায় ঘর চালাতে হবে। ব্যবসাতে লাখ টাকা উপার্জন হলেও, কিন্তু যদি এ.এম.প্যাটেল চাকরি করতে যায় তো কত বেতন পাবে ? খুব বেশী তো ছশো-সাতশো টাকা। ব্যবসা তো পূণ্যের খেলা। সেইজন্য চাকরিতে আমি যত পাব তত টাকাই ঘরে খরচা করা হবে, বাকিটা

ব্যবসাতেই থাকবে। ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সওয়ালাদের চিঠি আসে তো আমি বলি যে, 'এই টাকা আছে এটা ভরে দিন।' কোন 'এট্যাক' কখন আসবে তার কোন ঠিকানা নেই আর যদি সেই টাকা খরচ করে দিই তাহলে এখানে ইন্‌কাম্‌ট্যাক্সওয়ালাদের 'এট্যাক' আসবে আর সাথে-সাথে নিজের অন্য 'এট্যাক'ও আসবে ! সব জায়গায় 'এট্যাক' হতে শুরু হয়েছে কি না ? একে জীবন কি করে বলা যায় ? তোমার কি মনে হচ্ছে ? ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে না ? আমরা সেই ভুলকে মিটাতে হবে।

লক্ষ্মীর না ঘাটতি, না প্রাচুর্য্য

আমার কখনো টাকা-পয়সার ঘাটতি হয়নি আর প্রাচুর্য্য ও হয়নি। লাখ আসার আগে কোথা না কোথা থেকে বম এসে পড়বে (এমন কিছু হয়ে যাবে) আর খরচ হয়ে যাবে। মানে প্রাচুর্য্য তো কখনো হয়ই না, আর ঘাটতি ও হয় না, আর কিছু দাবিয়েও রাখি না। কেননা যদি আমার কাছে মিথ্যার টাকা আসে তবেই তো দাবিয়ে রাখতে হবে ? এমন বেইমানির সম্পদই আসে না তো দাবাবো কি ? আর আমি এমন চাই-ও না। আমার তো ঘাটতি না হোক আর প্রাচুর্য্য না হলেও অনেক হল !

উসুলী কর তখন হয়রানি আসে তো ?

এটা সন বিয়াল্লিশ-এর কথা, সেসব দিনে ফ্রেন্ডসার্কেলে টাকা-পয়সার লেন-দেন চলতো। সেই টাকা দেওয়ার পরে কেউ ফিরিয়ে দিতে আসত না। আগে তো কাউকে টাকা দিলে কেউ দুইশো-পাঁচশো কম ফিরিয়ে দিতো, সে পর্যন্ত ঠিক ছিল। আমার কাছে ছিল সেইজন্য বন্ধুদের হেল্প করতাম, কিন্তু পরে কেউ ফিরিয়ে দিতে আসে না। এতে আমার ভিতর থেকে আওয়াজ আসে কি, 'এটা ঠিকই হয়েছে, যদি এই টাকা উসুল করি তাহলে আবার ধার চাইতে আসবে।' টাকা চাইলে একটু-একটু করে পাঁচ হাজার ফিরিয়ে দেয় কিন্তু আবার দশ হাজার

নিতে আসে। সেইজন্য যদি নিতে আসাদের বন্ধ করতে হয় তো এই রাস্তা উত্তম! আমি এতটুকুতেই প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দিই, তালা লাগিয়ে দিই। উসুল করলে সে আবার আসবে! আর ওরা কি নিষ্কর্ষ বের করলো যে, 'উসুলী করছে না, চল আমাদের কাজ হয়ে গেছে।' সেইজন্য মুখ দেখাতেও আসে না আর আমি এটাই চাইছিলাম। মতলব, 'ভালই হয়েছে, মিটেছে জঞ্জাল, সুখে ভজবো শ্রীগোপাল' অর্থাৎ সেই সময় এই কলা হস্তগত হয়েছে!

আমার এক জন চেনা -জানা লোক টাকা ধার নিয়েছিল তারপর আর ফেরাতে আসে নি। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে সে বৈরিতায় বাঁধা আছে, সেইজন্য যদিও নিয়ে গেছে তবুও আমি বলি যে, তুই এখন আর আমাকে টাকা ফেরাতে আসবি না, তোকে ছাড় দিচ্ছি।' এমন যদি টাকা লোকসান করেও বৈরিতা থেকে মুক্তি পাও তাহলে সেটাই করবে।

ধার দিয়েছিলাম, তাকে আবার দিই! কেমন ফেঁসেছি?!

এমন কি না, সংসারে লেন-দেন তো চলতেই থাকে। কখনো কারো থেকে নিতে হয়, কখনো কাউকে দিতে হয়! অর্থাৎ কখনো কাউকে কিছু টাকা ধার দিলে আর সে ফেরত দেয় না, তো সেইজন্য মনে ক্লেশ তো হবেই, মনে হবে যে, 'সে কবে ফেরত দিবে, কবে ফেরত দিবে?' এর কোন অন্ত আছে কি?

আমার সাথেও এমন হয়েছিল তো! টাকা ফেরত না আসলে তার চিন্তা আমি প্রথম থেকেই করতাম না। এমনিই সাধারন ভাবে কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে বলতাম ঠিকই। আমি একজনকে পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, দেবার সময় কোন বই-খাতাতে লেখা হয়নি, না কোন কাগজে দস্তখত করানো হয়েছিল! এক দেড় বছর হয়ে গিয়েছিল। আমার ও মনে ছিল না। এক দিন সেই লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়। আমার মনে পড়ায় আমি তাকে বললাম, যদি এখন

হাতে আছে তো আমার পাঁচশো যা ধার নিয়েছিলেন, সেটা ফিরিয়ে দিন।' এতে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'পাঁচশো কিসের ?' আমি মনে করালাম যে, 'আপনি যে আমার থেকে ধার নিয়েছিলেন সেটা, 'এটা শুনে সে বলতে শুরু করলো, আপনি আমাকে কবে দিয়েছিলেন ? টাকা তো আমি আপনাকে ধার দিয়েছিলাম, সেটা আপনি ভুলে গেছেন কি ?' এতে আমি বুঝে গেলাম। একটু সময় থেমে, আমি বললাম, আমাকে একটু ভাবতে দিন।' একটু সময় চিন্তা করার ভান করে আমি বললাম, হ্যাঁ, মনে পড়ছে ঠিক, এক কাজ করুন, আপনি কাল এসে নিয়ে যাবেন।' পরের দিন টাকা দিয়ে দিই। সেই লোকটি এখানে এসে আমার সঙ্গে ঝগরা করে যে আপনি আমার টাকা ফিরিয়ে না দেন তো কি করবো আমি ? এমন অনেক ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে !

সেই জন্য এই সংসার কি করে পার করা যাবে ? আমরা কাউকে টাকা ধার দিলে সেটা কালো কাপোরের টুকরোতে বেঁধে সাগরে ফেলে দেওয়ার পর ফিরে পাওয়ার আশা রাখার সমান। যদি ফিরে পাও তো জমা করে নেবে আর দেনাদারকে চা-জল খাইয়ে বলবে, 'ভাই, আপনার ঋণ মানছি যে আপনি টাকা ফেরত দিয়েছেন অন্যথা এমন কালে কেউ ফেরত দেয় না। আপনি ফেরত দিয়েছেন সেটা আশ্চর্য বলা হবে।' সে যদি বলে 'সুদ মিলবে না।' তখন বলবে, 'মূলধন এনেছেন সেটাই যথেষ্ট।' বুঝতে পারছেন তো ? এমন সংসার ! ধার নেয় তার ফেরত দিতে কষ্ট হয় আর ঋণ দাতার ফিরে না পাওয়ার দুঃখ হয়। এখন এদের মধ্যে সুখী কে ? আর এ 'ব্যবস্থিত'! ফেরত দেয় না সেটাও 'ব্যবস্থিত ' আর আমাকে ডবল দিতে হয়েছে সেটাও 'ব্যবস্থিত'।

প্রশ্নকর্তা: আপনি দ্বিতীয় পাঁচশো টাকা কেন দিলেন?

দাদাশ্রী : আবার কোন অবতারে সেই লোকের সঙ্গে পালা না পরে সেই জন্য। এতটুকু জাগৃতি থাকে তো, কি এটা তো ভুল জায়গায় এসে গেছি।

ঠকেছি, কিন্তু কষায় না করার জন্য

আমার অংশীদার এক বার আমাকে বলে যে, 'লোকেরা আপনার সরলতার ফায়দা ওঠায়' । আমি বললাম, 'আপনি আমাকে বোকা ভাবেন সেইজন্য আপনিই বোকা, আমি বুঝে-শুনে ঠকি ।' এতে সে বললো, 'এখন আর আমি এমন বলবো না '। আমি বুঝলাম যে এই বেচারার মতিই এমন, ওর নিয়ত এমন, সেইজন্য যেতে দাও, লেট গো করো ! আমি কষায় থেকে মুক্ত হতে এসেছি। আমি কষায় না হোক সেইজন্য ঠকি । সেইজন্য আবার ঠকবো । জেনে-বুঝে ঠকলে মজা আসবে কি না ? জেনে-বুঝে ঠকবে এমন লোক কমই হবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হবেই না ।

দাদাশ্রী : ছেলেবেলা থেকে আমার 'প্রিন্সিপল' ছিল যে জেনে-বুঝে ঠকবো । আর কেউ আমাকে মূর্খ বানিয়ে ঠকাবে সেটা হতেই পারে না । এই জেনে-বুঝে ঠকাতে কি হয়েছে ? ব্রেন টপে পৌছে গেছে, যেখানে বড়-বড় জজ দের ব্রেন কাজ করে না এমন কাজ করতে শুরু করে । জজ যারা হয় তারাও জেনে-বুঝে ঠকার দলে । আর জেনে-বুঝে ঠকলে ব্রেন টপে পৌঁছে যায় । কিন্তু দেখবে, তুমি এমন প্রয়োগ করবে না । তুমি তো জ্ঞান নিয়েছ না ? এটা তো যখন জ্ঞান নাওনি তখন এই প্রয়োগ করার মতো ।

অর্থাৎ জেনে-বুঝে ঠকতে হবে, কিন্তু কার কাছে এভাবে ঠকবে ? যার সাথে আমাদের রোজকার ব্যবহার আছে তার সাথে ! আর বাইরেও কখনো-কখনো কারো কাছে ঠকবে , কিন্তু জেনে-বুঝে ! সামনের জন ভাববে যে আমি ওকে ঠকিয়েছি আর আমরা ভাববো যে ওকে মূর্খ বানিয়েছি ।

ব্যবসাতে, ওপন টু স্কাই

আমার কাছে ব্যবসায় সম্বন্ধে কথা বলার সময় হয় না ! ব্যবসা নিয়ে কি করব আর ?

ব্যবসার বিষয়ে আমি সব কিছু খোলাখুলি বলে দিতাম। এতে একজন বলে যে, 'এভাবে কেন বলে দেন ?' তখন আমি বললাম 'যে লোকের কাছ থেকে টাকা লোন নিতে চায় সে গুপ্ত রাখবে। আমার কোন লোনের দরকার নেই। আর যদি কেউ দিতে চায় তো খোলাখুলি ভাবে দিবে। আমার তো ওপন টু স্কাই যেমন। সেইজন্য বলে দিই কি এই বছর কুড়ি হাজার লোকসান হয়েছে। এটা আমি খোলা-খুলিই বলে দিই। ঝঞ্ঝাট নেই তো !'

হিসাব মেলে আর চিন্তা সমাপ্ত

জ্ঞান হওয়ার আগে একবার আমাদের ব্যবসাতে হয়েছিলো কি যে এক মহাশয় হটাৎ একদম দশ হাজার টাকার লোকসান করে দেয়, আমাদের একটা কাজ সেই মহাশয় হটাৎ অমনোনীত করে দেয়। সেই সময় দশ হাজার টাকার অনেক দাম ছিল, আজকাল তো দশ হাজার গোনাতেই ধরা হয় না ! আমার সেদিন গভীর ধাক্কা লাগে আর চিন্তা হতে থাকে, কথা এতদুর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন সেই ক্ষণে ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পাই যে, 'এই ব্যবসাতে আমার নিজের অংশীদারী কতটা ?' সেই সময় আমরা দুজন পার্টনার ছিলাম, আবার আমি হিসাব করলাম যে দুজন পার্টনারতো কাগজে আছে, কিন্তু বাস্তবে কত ? বাস্তবে আমার পত্নী, পার্টনারের ওয়াইফ, তার ছেলে-মেয়ে, এদেরকেও পার্টনারই বলা হবে তো ! তখন আমার মনে হলো যে এদের মধ্যে কেউ চিন্তা করছে না, তাহলে সমস্ত বোঝা নিজের মাথায় কেন নিই ? সেই দিন আমার এই বিচার আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কথাটা ঠিক তো ?

....লোকসানের অপেক্ষা করে তো ?

আমি সারা জীবন কন্ট্রেক্ট এর ব্যবসা করেছি আর নানা ধরনের কন্ট্রেক্ট করেছি। ওতে সাগরে জেটি-ও বানিয়েছি। ওখানে ব্যবসার শুরুতে আমি কি করতাম ? যেখানে পাঁচ লাখ লাভ হবার সেখানে আগের থেকে ঠিক করতাম যদি এক লাখ টাকা পাওয়া যায় তাহলেই যথেষ্ট। শেষে লাভ-লোকসান না হয় আর ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ভরার মতো আর আমাদের খরচা উঠে যায় তো অনেক হয়ে গেছে। আর পরে তিন লাখ পেলে কেমন আনন্দ হবে ? কারণ ধারণার থেকে বেশী মিলে গেছে। এখানে তো ধারণা করে চল্লিশ হাজার আর মেলে কুড়ি হাজার তো দুঃখী-দুঃখী হয়ে যায় !!

দেখুন, রীতিই পাগলের মতো কি না ! জীবন যাপনের রীতিই পাগলের মতো না ? আর যদি প্রথম থেকেই লোকসান নির্ধারিত করে তো তার থেকে সুখী আর কেউ হয় না। লোকসানের উপাসক হবে, তাহলে জীবনে লোকসান আসবে না ! লোকসানের উপাসক হলে তারপরে আর কি ?

মতভেদ এড়াতে, কষ্ট সহ্য করি

অংশীদারের সাথে পঁয়তাল্লিশ বছর অংশীদারী করি, কিন্তু একটাও মতভেদ হয় নি। তখন কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে না ? আভ্যন্তরীণ কষ্ট তো হয় কি না ? কারণ এই জগতে মতভেদ মানে এটা যে মুশকিলের সামনা করা।

পরিণামে, অংশীদার দেখে ভগবান

অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার আগেও আমি মতভেদ হতে দিই নি। ছাড়পোকার সঙ্গেও মতভেদ নয়। ছাড়পোকা বেচারারাও বুঝে গিয়েছিল যে এ বিনা মতভেদের মানুষ, আমাদেরকে আমাদের কোটা (অংশ) নিয়ে চলে যেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আপনি যে দিয়ে দিতেন, সেটা পূর্বের সেটেলমেন্ট (হিসাব/নিষ্পত্তি) হবে কি না, এর কি প্রমাণ ?

দাদাশ্রী : সেটেলমেন্ট-ই ! এটা কোন নতুন কথা নয় ! কিন্তু এটা সেটেলমেন্ট-এর প্রশ্ন নয় । এখন নতুন করে ভাব খারাপ করবে না ! এটা তো সেটেলমেন্ট, ইফেক্ট (পরিণাম), কিন্তু এই সময় নতুন ভাব যেন খারাপ না হয় । নতুন ভাব আমাদের যেন মজবুত হয় সেটাই করেক্ট (ঠিক) । কিছু ভালো মনে হলো না ফালতু ?

প্রশ্নকর্তা : এতে ক্লেশ থেকেও মুক্তি থাকে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সহ্য করলে ক্লেশ থেকেও মুক্তি থাকে আর শুধু ক্লেশ-মুক্তি নয়, সঙ্গে সামনের জনের, অংশীদার আর তার সমস্ত পরিবারের উর্ধগতি হবে । আমাদের এমন দেখে ওর মন ও বিশাল হয়ে যাবে । সংকীর্ণ মন বিশাল হয়ে যায় । অংশীদার ও রাত-দিন সঙ্গে থাকা সত্তেও শেষে এমন সৎকার করত কি, 'দাদা ভগবান আসুন, আপনি তো ভগবানই ।' দেখুন, অংশীদারের আমার উপর প্রেম এসেছে না ! সঙ্গে থাকে, মতভেদ হয় না আর প্রেম উৎপন্ন হয়েছে ! ওনার তো সব কাজ হয়ে যাবে কি না ?

আমি নিজের জন্য কিছু করি নি । এই ব্যবসা তো নিজে নিজেই চলতো । আমার অংশীদার এইটুকু বলতো কি, আপনি যে এই আত্মা সম্বন্ধী সব করছেন, সেটা করতে থাকুন আর দুই-তিন মাসে এক-আধ বার এসে কাজের নির্দেশ দিয়ে যাবেন যে 'এভাবে করবে'। বাস এতটুকু কাজ সে আমাকে দিয়ে করাতো ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অংশীদারের ও তো কিছু ইচ্ছা হবে ? কিছু পাওয়ার ? অংশীদারি করবে, যদি তার কিছু লাভ হয় তবেই তো অংশীদারি করবে ?

দাদাশ্রী: হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে সেই সময় ওনার কেমন লাভ হয়েছে।

দাদাশ্রী : ওনার তো সাংসারিক রূপে, টাকা-পয়সার বিষয়েও সমস্ত লাভ হবেই তো ! সে তো নিজের ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন যে দাদাজীর উপস্থিতি সেটাই শ্রীমন্ত। আমার কোন দিন টাকা-পয়সার অভাব হয় নি।

(৫) জীবনের নিয়ম

টেস্টেড করেছি নিজেকে

১৯৬১-৬২ তে আমি একবার বলেছিলাম, 'যে আমাকে এক চড় মারবে, তাকে আমি পাঁচশো টাকা দেবো।' কিন্তু কেউ চড় মারতে আসে নি। আমি বলি, 'আরে, পয়সার টানাটানি তো লাগাও না !' তখন বলে, 'না, আমার কি গতি হবে ?' কে মারবে ! এমন কে আসবে ! যদি কেউ বিনামূল্যে মারে তাহলে সেই দিন তাকে মহা পূণ্য বোঝা উচিৎ যে আমাকে এত বড় পুরস্কার আজ দিয়েছে। এটাকে তো অনেক বড় পুরস্কার বোঝা উচিৎ। এই সব আগে আমরাও দিতে কোন চেষ্টা বাকি রাখি নি তো, সেটাই ফিরে এসেছে।

আমি কি বলতে চাইছি যে এই জগতের ক্রম কেমন হয় যে তোমাকে যে জামা ১৯৯৪ তে পাওয়ার কথা সেটাকে আজ ব্যবহার করে নিলে, তাহলে ১৯৯৪ এ বিনা জামায় থাকবে, এটাই আমি বলতে চাইছি, যাতে তুমি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারো। আবশ্যকতা না হলে কোন বস্তু বের করবে না আর যদি বের করতে হয় তবুও কোথাও না কোথাও কম হয়েছে তবেই বের করবে। এটা আমার নিয়ম ছিল। সেইজন্য আমি বলি এতো ঘিসাই এখনো হয় নি, সেইজন্য ফেলে দেবে না। কেননা একটু খারাপ হয়েছে আর এখনো কাজে লাগানো যাবে, সেটা এমনিতে ফেলে দেওয়া তো মিনিংলেস (অর্থহীন) বলা হবে ! অর্থাৎ এই সব বস্তু তুমি ব্যবহার করেছ তার কোন হিসাব তো হবে কি না ? এই সবের হিসাব আছে, আর এতদুর পর্যন্ত হিসাব আছে যে এক এক পরমাণু পর্যন্ত হিসাব আছে, বলো, এখানে গড়বড় কি করে হতে

পারে ? 'ব্যবস্থিত'এর এমন নিয়ম, পরমাণু পর্যন্ত হিসাব থাকে। সেই জন্য কোন কিছু নষ্ট করবে না।

জগতে ফাঁকি চলে না

আমাকে জল নষ্ট করতে হয়। আমি জ্ঞানী পুরুষ, আমাকে তো, জ্ঞানী পুরুষদের তো ত্যাগাত্যাগ সম্ভব নয়, তবু আমাকে জল নষ্ট করতে হয়। আমার পায়ে যে ফ্রেকচার হয়েছিলো, সেইজন্য বিলাতী পায়খানায় বসতে হয়। যেখানে আবার জলের জন্য চেন টানতে হয় আর দুই ডিব্বা জল চলে যায়। এটা কিসের জন্য বলছি ? জলের অভাব না জলের দুর্মূল্য সেইজন্য ? না, কিন্তু তখন জলের কত জীব এমনি বিনা কারণে ধাক্কা- ধাক্কিতে মারা যায়। আর যেখানে কম জলে কাম চলে সেখানে এত জলের অপচয় কেন করা হয় ? যদিও আমি জ্ঞানী পুরুষ এইজন্য ভুল হতেই অবিলম্বে ঔষধ ঢেলে দিই। ঔষধ তো আমাকেও লাগাতে হবে, কারণ এখানে জ্ঞানী পুরুষ হোক আর কেউ হোক, কারো চলে না। এটা অন্ধের রাজ নয়। এটা বীতিরাগী দের রাজ, চব্বিশ তীর্থঙ্কর দের রাজ। তোমার ভাল লাগে এই তীর্থঙ্কর দের এসব কথা ?

জাগৃতি, পৃথকতার

আমার মাঝে-মাঝে জ্বর হয় তখন কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে যে, 'আপনার জ্বর এসেছে কি ?' তখন আমি বলি যে, 'হ্যাঁ, ভাই এ. এম. প্যাটেলের জ্বর এসেছে, যাকে আমি জানি।' 'আমার জ্বর এসেছে' এমন বললে তো আমার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। নিজের জন্য যেমন কল্পনা করবে অবিলম্বে নিজে তেমন হয়ে যাবে। এইজন্য আমি এমন বলি না যে 'আমার জ্বর এসেছে '।

'আমার' অনুভবের কথা

আমি ফার্স্ট ক্লাসে রেল যাত্রা করি না, কারণ অন্য পেসেঞ্জাররা অনুসরণ করে। আমি উল্টা-সিধা বলতে পারি না, ওরা জিজ্ঞাসা করে

কি আপনার ঠিকানা কি, তখন আমি ঠিক-ঠিক বলে দিই আর খুঁজে-খুঁজে ঘরে পৌছে যায়। অর্থাৎ এই সব ফালতু ঝঞ্ঝাট বাড়ানো। এর থেকে আমার নিজের ভাইদের মতো থার্ড ক্লাসের পেসেঞ্জার ভালো। এতে কি আসা-যাওয়ার সময় ধাক্কা লাগে তো ভিতরের কষায় ভাব কি তা জানতে পারা যায়। কারো ধাক্কা লাগলে ভিতরের দুর্বলতা জানা যায়। তাতে এভাবে সব দুর্বলতা বেরিয়ে যায়।

রেলযাত্রা শেষ করার পর যখন পা ব্যথা হয় তখন কি বলি, 'অম্বালালভাই, তোমার পায়ে খুব ব্যথা হচ্ছে, না ? ক্লান্ত হয়ে গেছো কি? চেপে বসতে হয়েছে সেইজন্য পায়ে ব্যথা হয়েছে হয়তো।' তারপর বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পিঠ থপথপিয়ে বলি, 'আমি আছি তো তোমার সাথে, ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি, শুদ্ধাত্মা ভগবান তো আছি তোমার সাথে।' যাতে আবার ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যায়।

বিপত্তি আসলে পিঠ থপথপিয়ে বলবে। জ্ঞান হওয়ার আগে একলা ছিলে, এখন দুজন হয়েছ। আগে তো কারো সহায় ছিল না। নিজেই নিজের থেকে সহায় খুঁজতে। এখন এক থেকে দুই হয়েছ। এমন কখনো করেছ কি ?

প্রশ্নকর্তা : করেছিলাম।

দাদাশ্রী : সেই সময় আমাদের অন্য রকম অনুভব হতো কি না ? যেন সারা ব্রহ্মান্ডের রাজা এমন ভাবে নিজেকে বলতে হবে। এই সব আমার অনুভবের কথা তোমাকে দেখালাম।

'আমি', 'প্যাটেল' এর সাথে অনেক কথা বলতাম। আমার মজা আসতো এইরকম কথা বলতে। আমিও এত বড় ছিয়াত্তর বছরের অম্বালালভাইকে এরকম বলতাম কি না, 'ছিয়াত্তর বছরে কিছু সেয়ানা হয়েছ ? এ তো অনুভবের থেকে ঠিক জ্ঞান পেয়ে সেয়ানা হয়েছি !'

প্রশ্নকর্তা : আপনি কবে থেকে কথা বলতেন ?

দাদাশ্রী : জ্ঞান হবার পর। আগে কি করে কথা বলব ? 'আমি আলাদা' এই ভান হয় তার পর ! যখন বিয়ে করতে বসেছিলাম না সেটা মনে করে অম্বালালকে বললাম যে, 'ওহোহো ! তুমি তো বিয়ে করতে বসেছিলে না ! পরে মাথা থেকে পাগড়ী সরে গেল, তখন তোমার বিধুর হওয়ার বিচার এল।' এমন ও আমি বলি। আগের সব দেখতে পাই। কিভাবে পাগড়ী সরে গিয়েছিল, কেমন বিয়ের মন্ডপ হয়েছিল, সব দেখতে পাই। মনে পরতেই সব দেখতে পাই। আমি বলি আর আমি আনন্দ পাই। এসব কথা বললে ও আনন্দ পায়।

(৬) পত্নী হীরাবার সাথে এডজাস্টমেন্ট

মতভেদ এড়াতে সাবধানী রাখি

বিয়ের সময় বলা হয়, 'সময় অনুসারে সাবধান'। এটা যে পুরুত মশাই বলেন সেটা ঠিকই বলেন, সময় আসলে সাবধান হওয়া আবশ্যক, এই সর্তে সংসারে বিয়ে করানো হয়। সে যখন উত্তেজিত হয়ে যায় আর আমিও যদি উত্তেজিত হয়ে যাই, সেটাকে অসাবধানী বলা হবে। সে যখন উত্তেজিত হয়, আমি শান্ত হয়ে যাই। সাবধানী রাখা জরুরি কি না ? এভাবে আমি সাবধানী রাখতাম। ফাটল হতে দিই না। ফাটলের অবস্থা আসলে আবার ওয়েল্ডিং করে দিই।

আমার ত্রিশ বছর বয়সেই আমি সব রিপেয়ার করে দিয়েছিলাম। তার পর ঘরে কোন ঝঞ্ঝাট নেই, মতভেদ নেই। যদিও প্রথমে আমার ওর সঙ্গে ঝগড়া হতো, সেটা না বোঝার ঝগড়া ছিল। কারণ স্বামীত্ব দেখাতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তা : সবাই যেমন স্বামীত্ব দেখায় আর আপনি যদি স্বামীত্ব দেখান , তাতে অন্তর থাকবে কি না ?

দাদাশ্রী : অন্তর ? কেমন অন্তর ? স্বামীত্ব দেখানো মানে পাগলামি ! মেডনেস বলা হয় !! অন্ধকারের কত ভেদ হবে ?

প্রশ্নকর্তা : তবু ও আপনার একটু অন্য রকমের হবে কি না ? আপনার তো কিছু নতুন ধরনের হবে তো ?

দাদাশ্রী : একটু অন্তর হবে। একবার মতভেদ বন্ধ করার পর আবার সেই কথার উপর মতভেদ হতে দিই নি ! আর যদি হয়ে যায় তো আমি মুড়তে জানি। মতভেদ তো প্রাকৃতিক রূপে হয়ে যায়, কেননা আমি ওর ভালোর জন্য বলি তবুও ওর উল্টো মনে হয় তাহলে তার কি উপায় ? ঠিক-ভুল বলে কিছুই নেই এই সংসারে ! যে টাকা চলে সেটা খাঁটি আর না চললে নকল। আমার তো সব টাকাই চলে। তোমার তো কোথাও-কোথাও চলে না হয়তো ?

প্রশ্নকর্তা : এখানে দাদাজীর কাছে চলে, অন্য কোথাও চলে না।

দাদাশ্রী : এমন ? তাহলে ঠিক আছে ! এই অফিসে চলে তাহলেই অনেক হয়ে গেলো। এটা তো জগতের হেড অফিস বলা হয় , আমি যে ব্রহ্মান্ডের মালিক ! এমন শুনলে মানুষ প্রসন্ন হয়ে যায় যে ব্রহ্মান্ডের মালিক ! এমন তো কেউ বলেই নি। আর কথাটাও ঠিক তো ! যার এই মন-বচন-কায়ার স্বামীত্ব ছুটে গেছে , তাকে সমস্ত ব্রহ্মান্ডের মালিক বলা হয়।

পত্নীকে প্রমিস করেছি, সেইজন্য...

হীরাবার একটি চোখ ১৯৪৩ তে চলে যায় । ডাক্তার ওনার চিকিৎসা করছিল। চোখে ব্যথা হতো। চোখের চিকিৎসা করতে গিয়ে ওনার চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

এতে লোকের মনে হলো যে এ এক 'নতুন বর' দাড়ালো। আবার বিয়ে দেওয়া হোক। কন্যার আধিক্য ছিল ! আর কন্যাদের মা-বাবাদের ইচ্ছা এমন যে এদিক-ওদিক কেমন করেই হোক শেষে কুয়েতে ধাক্কা দিয়েও নিষ্পত্তি করা। সেইজন্য ভাদরনের একজন প্যাটেল আসে, তার শ্যালকের মেয়ে ছিল, সেইজন্য আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কি চাই ?' এতে সে বললো, 'আপনার উপরে কেমন

হলো ?' সেইসময়, ১৯৪৪ এ আমার বয়স ছত্রিশ বছর ছিল, আমি ওনাকে বললাম, 'কেন আপনি এরকম কেন বলছেন ?' এতে সে বলে, 'এক তো হীরাবার চোখ চলে গেছে। দ্বিতীয়ত ওনার কোন সন্তান ও নেই।' আমি বললাম, 'কোন সন্তান নেই। আমার কাছে কোন স্টেট ও নেই। বড়োদার মতো স্টেট নেই যে তার জন্য উত্তরাধিকারী চাই। যদি স্টেট থাকতো তাহলে সন্তান কে দিয়েছে বলা হতো। এই এক-আধ কুঁড়েঘর আছে, অল্প-একটু ক্ষেত আছে। আর সে ও আমাকে আবার কিষান ই বানাবে কি না! যদি সেই স্টেট হতো তাহলে ঠিক আছে!' আর আবার আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আপনি এরকম কেন বলছেন ? আমার হীরাবার সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন প্রমিস করেছি। সেইজন্য এক চোখ চলে গেছে তো কি হয়েছে! যদি দুটো চোখ চলে যায় তখনো আমি হাত ধরে চলাবো।' সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনাকে পণ দিই তো কেমন হবে ?' আমি বললাম, 'আপনি আপনার মেয়েকে কুয়োতে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইছেন ? এতে তো হীরাবার দু:খ হবে। হীরাবার দুঃখ হবে কি হবে না ? সে ভাববে যে আমার চোখ চলে গেছে সেইজন্য এই পরিস্থিতি এসেছে না!' আমি তো প্রমিস টু পে করেছি। আমি ওকে বলি, 'আমি কোন অবস্থাতেই ফিরবো না, যদি দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক হয়ে যায় তবুও প্রমিস মানে প্রমিস!' কেননা আমি প্রমিস করেছি, প্রমিস করার পর বিমুখ হব না। আমার এক জন্ম ওর জন্য, কি অঘটন হয়ে যাবে এতে! বিয়ের মন্ডপে হাত ধরেছিলাম, হাত ধরেছি মানে প্রমিস করেছি আমি। আর সবার সামনে প্রমিস করেছিলাম। ক্ষত্রিয় হিসাবে আমি যে প্রমিস করেছিলাম, তার জন্য এক জন্ম উৎসর্গ করে দিতে পারি।

কেমন বিবেচনা! কেমন এডজাস্টমেন্ট!

আমিও যখন কঢ়ী (এক ধরনের গুজারাটী রান্না) বেশী নোনতা হয় তখন কম খাই অথবা কঢ়ী না খেয়ে চালাতে না পারলে আস্তে করে কঢ়ীতে জল মিশিয়ে নিই। বেশী নোনতা হয়ে গেলে একটু জল মিশিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ নোনতা কম হয়ে যাবে। এতে একদিন হীরাবা

দেখে ফেলে চিৎকার করে ওঠে, 'এটা কি করলে ? এটা কি করলে ? তুমি এতে জল ঢাললে ?' তখন আমি বলি, 'এটা জল ঢেলে উনুনে রান্না করা হয় আর দু বার ফুটাতে হয় এতে তুমি ভাব যে রান্না হয়ে গেছে আর আমি এখানে জল ঢাললাম বলে কাঁচা হয়ে গেল, এরকম তুমি মনে করো ? এমন কিছু হয় না !' কিন্তু সে খেতে দেয় না। জল ঢাললে উনুনে তো বসাতেই হবে কি না ?

এ তো সব মনের মান্যতা। মন যদি এমন মেনে নেয় তো সেটাই ঠিক মনে করবে, অন্যথা বলবে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু খারাপ হয়ই না ! এই সবই পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী আর আকাশ ! সেজন্য কিছুই খারাপ-টারাপ হয় না।

নিরন্তর জাগৃতি যজ্ঞে, ফলিত 'অক্রম বিজ্ঞান'

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদাজী, আপনি যা করেছেন, সেটা কতটুকু জাগৃতির সাথে জল ঢালা হয়েছিল ? আপনি ওনার দুঃখ না হয় সেইজন্য বলতে চান নি যে, নুন বেশী হয়ে গেছে সেইজন্য জল ঢেলেছিলেন।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অনেক বার তো চায়ে চিনি থাকে না, তখনো আমি মুখ খুলি না। এতে লোকেরা বলে যে, 'এভাবে চালাতে থাকো তো সারা ঘর নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বলি, 'কাল আপনি দেখবেন।' আবার পরের দিন সে বললো যে, 'কাল চা-য়ে- চিনি ছিল না তবুও আপনি আমাকে কিছু বলেন নি ?' আমি বলি, 'আমি তোমাকে বলার কি দরকার ?' তুমি তো জানতেই পারবে ! যদি তুমি চা না খেতে তাহলে আমার বলার দরকার পরতো। কিন্তু তুমিও চা খাও, তাহলে আমার বলার কি দরকার ?'

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু কত জাগৃতি রাখতে হয় প্রতি মুহূর্তে ?

দাদাশ্রী : প্রত্যেক ক্ষণ, চব্বিশ ঘন্টা জাগৃতি, তার পর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। এই জ্ঞান কিছু এমনিই হয় নি !

আমি এ সব যে বলি , তোমরা জিজ্ঞাসা করলে সেই জায়গার দর্শন আমার সামনে ভাসে। দর্শন মানে যথাপূর্ব যেমন হয়েছিল তেমন দেখতে পাওয়া। যেমন হয়েছিল তেমন দেখতে পাওয়া যায় !

মতভেদের আগের সাবধানী

আমাদের মনে যদি কলুষিত ভাব না থাকে তাহলে সামনের জনের মনেও কলুষিত ভাব হবে না। আমরা বিরক্ত না হলে সে ও ঠান্ডা হয়ে যাবে । দেওয়ালের মতো হয়ে যাবে যাতে শুনতে না পাও । আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু কোন দিন মতভেদ হয়নি। হীরাবার হাত থেকে ঘি পড়ে গেলেও আমি চুপচাপ দেখতে থাকি। সেই সময় আমার জ্ঞান হাজির থাকে যে সে ঘি ফেলবে না। আমি যদি বলি যে ফেল তবু সে ফেলবে না। জেনে-বুঝে কেউ ঘি ফেলে কি ? না তো ? তবুও ঘি পড়ে গেলে, সেটা আমি দেখতে থাকি ! মতভেদ হবার আগেই আমার জ্ঞান অন দ্যা মৌমেন্ট (তৎক্ষণাৎ) হাজির থাকে।

প্রকৃতিকে চিনে সমাধানের ব্যবহার

আমাদের ঘরে কখনো মতভেদ হয় নি । আমরা তো হলাম পাটীদার, সেইজন্য হিসাবে আমাদেরকে ধরা হয় না। অর্থাৎ যখনই ঘি পরিবেশন করা হয় তখন ঘি এর পাত্র আস্তে-আস্তে, ঘি হিসাব করে ঢালা এমনভাবে ঝুঁকাই না। তাহলে কিভাবে ঝুঁকাই আমরা ? এই সিধা নাইন্টী ডিগ্রী ! অন্য জায়গায় লোকে কি করে ? ওখানে দেখবে তো, সব সময় ডিগ্রী ডিগ্রীওয়ালা (এক্টু-একটু করে ঢালা)। এই হীরাবাও ডিগ্রী ডিগ্রীওয়ালাদের মধ্যে একজন ছিল। এই সব আমার পছন্দ ছিল না আর মনে হতো এটা তো আমাকে খারাপ দেখায়। কিন্তু আমি প্রকৃতি কে চিনে নিয়েছিলাম যে সে এমন প্রকৃতির। কিন্তু যদি আমি কখনো ঢেলে দিই তো সে চালিয়ে নেবে। সে ও আমাকে বলে 'আপনি তো ভোলা, সবাইকে বিলি করতে থাকেন।' তার কথাও

ঠিক ! আমি আলমারীর চাবি ওকেই দিয়ে রেখেছি। কেননা কেউ (কিছু চাইতে) আসলে, সে সত্যিই দুঃখী, না অভিনয় করছে তা না জেনে আমি দিয়ে দিতাম। আমার এমন ভুল হতেই থাকে আর সামনের জন বিনা কারণে এনকারেজমেন্ট পেতে থাকে, এমন হীরাবার অনুভব ছিল আর সেইজন্য আমি চাবি ওকেই দিয়ে দিই। এই সব অজ্ঞান দশাতে হতো, জ্ঞান হওয়ার পর মতভেদ হয় নি।

অস্বীকার করেও মতভেদ এড়িয়েছি

আমি তোমাদেরকে যে এসব কথা বলি সে সব নিজের উপর ট্রায়াল না করে বলি না। সব পরীক্ষা করার পরের কথা। জ্ঞান ছিল না তখন ও ওয়াইফের সাথে আমার কোন মতভেদ ছিল না। মতভেদ মানে দেওয়ালে মাথা ঠোকা। লোকের যদিও এর জ্ঞান নেই কিন্তু আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে ওটা খোলা চোখে দেওয়ালে ধাক্কা খাওয়ার মতো, মতভেদের জন্য।

হয়েছিল কি, একবার হীরাবার সাথে আমার মতভেদ হয়ে যায়। আমি ও ফ্যাঁসাদে পরে গেলাম। আমার ওয়াইফ কে আমি 'হীরাবা' বলি। আমি তো জ্ঞানী পুরুষ, আমি সব শ্রদ্ধেয় মহিলাদের 'বা' বলি আর বাকি সব মেয়েদের 'বিটিয়াঁ' বলি। সেইজন্য, তোমরা জানতে চাইছো বলে বলছি, বেশী বড় গল্প নয়, কথাটা ছোট।

একবার আমাদেরও মতভেদ হয়ে যায়। আমি ফ্যাঁসাদে পড়ে গেলাম। হীরাবা আমাকে বলে, 'আমার ভাইয়ের চার মেয়ে, ওদের মধ্যে সবথেকে বড় মেয়ের বিয়ে, ওকে আমরা রূপোর কি জিনিস দেবো ?' তখন আমি বললাম, 'ঘরে যা আছে দিয়ে দাও।' এতে সে কি বলতে শুরু করলো ? আমাদের ঘরে সাধারনত 'আমার-তোমার' শব্দের ব্যবহার হয় না, 'আমাদের-নিজের' ব্যবহার হয় ! কিন্তু সেদিন সে বললো যে, 'আপনার মামার ছেলেদেরকে তো এতো বড় বড় রূপোর থালা দিয়েছিলে !' অর্থাৎ সেদিন কথায়-কথায় 'আমার-

তোমার' হয়ে যায় ! 'আপনার মামার ছেলে' বলে, অবস্থা এই পর্যন্ত পৌঁছায়। এটা আমার বোকামি, এমন আমার মনে হলো। আমি তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে দিলাম। ফিরে গেলে ক্ষতি নেই। মতভেদ হবার থেকে অস্বীকার করা ভালো, সেইজন্য আমি সেই ক্ষণেই অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, 'আমি এরকম বলতে চাই নি, সাথে নগদ পাঁচশো এক টাকা দিয়ে দেবে !' তখন সে বলে যে, 'কি ! আপনি তো বোকা, বোকাই থেকে গেলেন ! খুব সরল। এত টাকা দেয় নাকি কেউ ?' দেখুন জিত হলো কি না আমার ! আমি বলি, 'পাঁচশো এক টাকা দিয়ে দেবে আর সঙ্গে রূপোর ছোট বাসন দিয়ে দেবে।' তখন সে কি বলে, 'আপনি বোকা। এতো বেশী টাকা দেয় নাকি কেউ ?' দেখুন, মতভেদ মিটিয়ে দিলাম না ! মতভেদ তো হতেই দিই নি তার উপর সে আমাকে বললো যে, 'আপনি খুব সরল।' এ তো 'আমার' ভাই এর ওখানে কম দেন এই বিচার ওর মনে হত, তার বদলে সে এমন বলে কি এত বেশী দিতে হয় না !

অচল সিক্কা, ভগবানের চরণে

ঘরে নিজের চলন রাখবে না, যে মানুষ চলন রাখে তাকে পথভ্রান্ত হতে হয়। আমিও হীরাবাকে বলে দিয়েছিলাম যে আমি অচল সিক্কা। আমার পথভ্রান্ত হওয়া পোষাবে না ! অচল সিক্কা তোমার কি কাজের ? ভগবানের কাছে পড়ে থাকবে । ঘরে নিজের আধিপত্য দেখাতে যাবে তো টক্কর হবে কি না ? আমাদের এখন 'সমভাবে নিকাল (নিষ্পত্তি)' করতে হবে। ঘরে ওয়াইফ এর সাথে 'ফ্রেন্ড' এর মতো থাকতে হবে। ও তোমার 'ফ্রেন্ড' আর তুমি ওর 'ফ্রেন্ড' ! আর এখানে কেউ লিখে রাখে না কি ঘরে চলন তোমার ছিল না ওর ছিল ! মিউনিসিপ্যালিটি -তেও নোট হয় না আর ভগবানের ওখানেও নোট করা হয় না। আমাদের ভোজন চাই না চলন চাই ? সেইজন্য ভাল ভোজন কি ভাবে পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে হবে । যদি মিউনিসিপ্যালিটি-ওয়ালারা নোট রাখতো কি ঘরে কার চলে, তাহলে আমিও এডজাস্ট হতে পারতাম না। এসব তো কেউ নোট করে না !

যখন আমি বাড়োদা যাই তখন ঘরে আমি হীরাবার গেস্ট-এর মতো থাকি। যদি ঘরে কুকুর ঢুকে যায় তাহলে হীরাবার কষ্ট হবে, 'গেস্ট' এর কি কষ্ট ? কুকুর ঢুকে যায় আর ঘি খারাপ করে দেয় তাহলে তো যে মালিক তার চিন্তা হবে , গেস্ট এর কি ? গেস্ট তো শুধু দেখবে। বেশী হলে জিজ্ঞাসা করবে যে কি হয়েছে ? তখন সে বলবে যে ঘি খারাপ হয়ে গেছে। এতে গেস্ট বলবে, আরে, খুব খারাপ হলো এমন নাটকীয় রূপে বলবে। বলতে তো হবে যে খুব খারাপ হয়েছে। যদি আমরা বলি যে ভাল হয়েছে তাহলে ঘর থেকে বের করে দেবে। আমাদের কে গেস্ট-এর মতো থাকতে দেবে না।

তোমাকে ছাড়া ভাল লাগে না

আমি এত বয়স হওয়ার পরও হীরাবাকে বলি, আমি যখন বাইরে গ্রামে যাই, তখন তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না। যদি এরকম না বলি তাহলে সে মনে কি ভাববে ? আমার ভালো লাগে তো ওর কেন ভালো লাগবে না ? এমন বললে সংসার ঠিক থাকে। তুই ঘি ঢাল না, না ঢাললে রুখা- সুখা লাগবে ! সুন্দর ভাব ঢাল ! আমি বলি তো ! আবার সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার আমাকে মনে পরে ?' আমি বলি, 'খুব মনে পরে, অন্যদের কে মনে পরে তো তোমাকে কেন মনে পরবে না ?' আর মনে পরেও, মনে পরে না এমন নয়।

কত সামলিয়েছে তখন ?

পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে, ঘরে ওয়াইফ-এর সাথে মতভেদ হয় নি। ও মর্যাদায় থেকে কথা বলে আর আমিও মর্যাদা রেখে কথা বলি । ও কোনদিন মর্যাদার বাইরের কথা বললে আমি বুঝে যাই যে সে মর্যাদা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য আমি বলে দিই যে তোমার কথা ঠিক, কিন্তু মতভেদ হতে দিই না। এক মিনিটের জন্যও ওকে অনুভব হতে দিই না যে আমাকে দুঃখী করে। আমার ও মনে হয় না যে সে আমাকে দুঃখী করছে।

এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বর্তমানে আপনার ওয়াইফ-এর সাথে আপনার ব্যবহার কেমন ? 'আসুন, বসুন' বলা হয় ? আমি বললাম, "না, 'হীরাবা' বলি, সে এত বড় ছিয়াত্তর বছরের আর আমি আঠাত্তরের, এখন 'আসুন, বসুন' বলা শোভা দেবে ? আমি হীরাবা বলে সম্ভোধন করি।' সে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনার প্রতি ওনার পূজ্য ভাব আছে কি ? আমি বললাম, আমি যখন বড়োদা যাই, তখন সে প্রথমে বিধি করে তারপর আসন নেয়। ওখানে চরণে মাথা রেখে বিধি করে। সে প্রতিদিন বিধি করে। এরা সবাই দেখেছে, আমি ওর কেমন দেখা-শোনা করেছি যে সে বিধি করে ?' কোন জ্ঞানীর স্ত্রী এমন বিধি করে নি। ওর আমি কেমন দেখা-শোনা করি ? তার অনুমান আপনি এর থেকে পেয়ে গেছেন তো ?

বিষয় সমাপ্তির পর, সম্ভোধন 'বা' !!!

যখন থেকে হীরাবার সাথে আমার বিষয় বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে ওকে 'হীরাবা' বলে সম্বোধন করি। (দাদাজী ৩৫ বছর বয়সে অখন্ড ব্রহ্মচর্য্যে এসে গিয়েছিলেন) তারপর আমাদের কোন বিবাদ হয় নি। আর আগে যে বিবাদ ছিল তা বিষয় কে নিয়ে, সহচর্য্যে তো কম-বেশী বিবাদ হতো। কিন্তু যতদিন বিষয়ের দংশন থাকবে, ততদিন এসব যাবে না। ঐ দংশন ছুটলে তবে যাবে। এটা আমার নিজের অনুভব বলছি। এটা তো আমার জ্ঞানের জন্য ঠিক আছে। অন্যথা যদি জ্ঞান না হতো তাহলে দংশন লাগতেই থাকতো। সেই অবস্থায় অহংকার তো থাকবেই ! তাতে অহংকারের এক ভোগ ভাগ হয় যে সে আমাকে ভোগে নিয়েছে আর সে বলে, 'সে আমাকে ভোগে নিয়েছে।' আর এখানে (জ্ঞানের পর) তার নিবারণ করা হয়। তবুও ডিশ্চার্জের কিচকিচ তো থাকবেই। কিন্তু সেটাও আমাদের মধ্যে ছিল না, তেমন কোন প্রকারের বিবাদ আমাদের মধ্যে ছিল না।

(৭) জ্ঞানী দশাতে এমন ব্যবহার

প্রত্যেক অবস্থা থেকে পার

এইসব তো আমার পৃথকীকরণ করা বস্তু, আর এসব এক অবতারের নয়। এক অবতারে এতো সব পৃথকীকরণ কোথায় সম্ভব ? আশি বছরে কতো পৃথকীকরণ করতে পারবো ? এসব তো অনেক অবতারের পৃথকীকরণ, যা আজ সব প্রকট হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা : অনেক অবতারের পৃথকীকরণ এই সময় এক সঙ্গে কি ভাবে প্রকট হয়েছে ?

দাদাশ্রী : আবরণ ভেঙ্গেছে সেজন্য। ভিতরে জ্ঞান তো পুরো আছেই। আবরণ ভাঙ্গতে হবে তো ? জ্ঞানতো ভিতরে আছেই, কিন্তু আবরণ ভাঙ্গলে প্রকট হয়ে যায়।

সব ফেজের (ক্রমোন্নতির দশা) জ্ঞান আমি খুঁজে বের করেছিলাম। সব 'ফেজেস' থেকে পার হয়ে এসেছি আর প্রত্যেক ফেজেস-এর আমি 'এন্ড'(অন্ত) করে দিয়েছি। তার পর এই 'জ্ঞান' হয়েছে।

বলার সময় ও শুদ্ধ উপযোগ

আমি এই যা কিছু বলি, তা উপযোগিতার সাথে বলি। সেসব রেকর্ড বলে। তাতে আমার উপযোগিতা থাকবে যে, কি কি ভুলে গেছি আর কি না ? স্বাদবাদে কোন ভুল হয়েছে, এটা আমি সুক্ষ্ম ভাবে দেখি আর যা বলছি তা রেকর্ড। লোককে ও রেকর্ডই বলে, কিন্তু সে মনে ভাবে যে আমি বলছি। আমি নিরন্তর শুদ্ধ উপযোগিতায় থাকি, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় ও।

বিধি বিনা সময় নষ্ট করি নি

আমি তো এই কথা-বার্তায় কি হচ্ছে সেটাই দেখি। আমি ক্ষণের জন্য ও, এক মিনিট ও উপযোগের বাইরে থাকি না । আত্মার উপযোগ হতেই থাকে।

আমার বিধি করতে হবে, মন যখনই অবসর পায় অবিলম্বে ভিতরে বিধি শুরু হয়ে যায়, সেই সময় সহজ রূপে সবার এমন মনে হয় যে দাদাজী কোন কাজে ব্যস্ত ! মুড নেই এমন তো কেউ ভাবেই না, কোন কার্য্যে হবে, এতটুকু কার্য্য আমি চালিয়ে নিই। আমার যে বিধি করার, সেটা বাকি থেকে যায়। দুপুরে সবাই এসে গেলে হয় না তাই যখন এখানে অবসর পাই তখন সেটাও হয়ে যায়। আর সেটাও শুদ্ধ উপযোগের সাথে।

ভোজনের সময়, দাদার উপযোগ ...

ভোজনের সময় আমি কি করি ? ভোজনে সময় বেশী লাগে, খাই কম আর ভোজন করতে-করতে কারো সাথে কথা বলি না, শোর-গোল করি না অর্থাৎ ভোজনেই একাগ্র থাকি। আমি চিবাতে পারি সেইজন্য চিবিয়ে-চিবিয়ে খাই আর তার কি স্বাদ কি তা জানি, ওতে লুব্ধতা করি না। ওতে সংসারের লোক লুব্ধতা করে, যখন কি আমি সেটাকে জানি। কত মজাদার স্বাদ, সেটা জানি যে এটা এমন ছিল। একজেক্ট জানা, স্বাদমগ্ন হওয়া আর ভোগা। জগতের লোক হয় ভোগে না হয় স্বাদমগ্ন হয়।

আমি তো ঠান্ডাতে যখন শাল ঢাকা দিতে হয় তখন একটু সরিয়ে দিই। যদি ঠান্ডা হাওয়া লাগে তাহলে ঘুম আসবে না, এতে সারা রাত জেগে থাকবো। আর যদি ঠান্ডা না হয় তাহলে কাশি আসলে জেগে যাই, তার পর উপযোগে থাকি।

অনেক বছর আমি, রাতে শরীর খারাপ হলেও অথবা রাতে যা কিছুই হোক, সকালে সাড়ে ছটার সময় জেগে যাই। আমি জেগে গেলে

সাড়ে ছটাই বাজে। বাস্তবে আমি ঘুমাই ই না। রাতে আড়াই ঘন্টা আমার ভিতরে বিধি চলে। সাড়ে এগার পর্যন্ত সৎসঙ্গ চলে। বার বাজে শুয়ে পড়ি, সাধারনত শোবার সুখ, এই ভৌতিক সুখ আমি নিই না।

স্টোর নমস্কার করে, 'এই বীতরাগ'কে

যখন আমি আমেরিকা যাই তখন আমাকে শপিং মলে নিয়ে যায়। 'চলুন দাদাজী' বলে। যখন আমি স্টোরে যাই তখন স্টোর বেচারা আমাকে বার-বার নমস্কার করতে থাকে, যে ধন্য আপনি, আমার উপরে একটুও দৃষ্টি দূষিত করেন নি! সমস্ত স্টোরে কোথাও আমার দৃষ্টি দূষিত হয় নি! আমি সব দেখি ঠিকই কিন্তু দৃষ্টি দূষিত করি না। আমার কি দরকার কোন জিনিসের? কোন বস্তু আমার কাজে আসে না! তোমার দৃষ্টি দূষিত হয় কি?

প্রশ্নকর্তা : দরকার হয় এমন বস্তু কিনতে হয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমার দৃষ্টি দূষিত হয় না। এই স্টোর আমাকে দুই হাত জোড়ে নমস্কার করতে থাকে যে আজ পর্যন্ত এমন পুরুষের দর্শন হয় নি। কোন প্রকারের তিরস্কার ও নেই। ফার্স্ট ক্লাস, রাগ ও নেই, দ্বেষ ও নেই। আর আমাকে কি বলে? বীতরাগ! বীতরাগ ভগবান এসেছে!

বিশ্বে বীতরাগ অধিক উপকারী

যদি আমি বিয়েতে অংশগ্রহণ করি তাহলে কি বিয়ে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরবে? আমি বিয়েতে যাই কিন্তু সম্পূর্ণ বীতরাগ থাকতে পারি। যদি কখনো মোহ বাজারে যাই তখন সম্পূর্ণ বীতরাগ হয়ে যাই আর ভক্তির বাজারে গেলে বীতরাগতা একটু কম হয়ে যায়।

তন্ময়কার বিনা ব্যবহার

বিয়ের ব্যবহারিক অবসর কে সামলাতে হয়। যা ব্যবহারিক রূপে আমিও সামলাই আর তুমিও সামলাও, কিন্তু তুমি তন্ময়কার হয়ে

সামলাও আর আমি তার থেকে আলাদা থেকে সামলাই। অর্থাৎ ভূমিকা বদলানো দরকার, আর কিছু বদলানো জরুরী না।

জ্ঞানী আচরণ করে প্রকট আত্মারূপে

প্রশ্নকর্তা : এই তিন দিন ধরে আমার মনে একটাই বিচার ঘুরছে যে আপনি পঁচাত্তর বছর বয়সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই রকম ভাবে বসে আছেন আর আমাকে দেড় ঘন্টাতে কত বার নড়া-চড়া করতে হচ্ছে, তাহলে আপনার মধ্যে কোন শক্তি কাজ করছে ?

দাদাশ্রী : এই শরীর যদিও পুরাতন, কিন্তু ভিতরে সব কিছু তরুণ। সেইজন্য এক জায়গায় বসে দশ ঘন্টা পর্যন্ত বলতে পারি। এরা এসব দেখেছে। কেননা এই দেহ যদিও দেখতে এরকম, পঁচাত্তরের প্রভাব যুক্ত, চুলেও প্রভাব হয়েছে কিন্তু ভিতরে সবকিছু তরুণ। সেইজন্য এই শরীরে যখন কোন অসুখ আসে তখন লোকদের বলি যে, 'ভড়কে যাবেন না, এই শরীর ছুটবে না। ভিতরে তো সব এখনো তরুণ!' যাতে ওদের মনে স্থিরতা থাকে। কেননা আমার ভিতরের স্থিতি আলাদা। এক মিনিটের জন্যও আমি ক্লান্ত হই না। এই সময় ও রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আমার সাথে বসার মতো লোক চাই!

বাকি আমার ফ্রেশনেস কখনো যায় নি। তুমিও যখন ফ্রেশ থাকবে, তখন অনুভব করবে যে দাদাজী আমাদেরকে ফ্রেশ বানিয়েছে!

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, বয়স তো হয়ে গেছে তবুও ?

দাদাজী : তবুও! বয়স তো এই দেহের হয়েছে! আমার কোথায় বয়স হয়েছে ? আর দ্বিতীয় কি হয় যে তোমাদের সবার সায়কোলজিকেল ইফেক্ট হয়। আমার এমন কোন সায়কোলজিকেল ইফেক্ট হয় না যে 'আমার জ্বর হয়েছে'। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এমন বলবো, কিন্তু পরে আবার সেটা মুছে ফেলি। এতটা আমার জাগৃতি থাকে!

'আমি' 'নিজে'তে আর 'প্যাটেল' জগত কল্যাণের বিধিতে

বেশীর ভাগ সময় 'আমি' 'মূল স্বরূপ'-এ থাকি, মানে প্রতিবেশী হিসাবে থাকি। আর একটু সময়ের জন্য এর থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসি। 'মূল স্বরূপ'-এ থাকার জন্য পরে ফ্রেশনেস যেমন তেমন-ই থাকে! রাত্রেও বেশীরভাগ সময় ঘুমাই না। পোয়া ঘন্টা একটু তন্দ্রা আসে ঐটুকুই, দুই সময় মিলিয়ে পোয়া ঘন্টা, শেষ তো কেবল চোখ বন্ধ করে থাকি। এই কান দিয়ে একটু কম শুনি তাতে লোকে ভাবে দাদাজীর ঘুম এসে গেছে আর আমিও ভাবি যে যা ভাবছে সেটাই ঠিক। আমাকে বিধি করতে হয়, সেইজন্য আমি নিজেতে আর এ. এম. প্যাটেল বিধিতে থাকে, অর্থাৎ এই সংসারের কল্যাণ কি করে হবে, তার সমস্ত বিধি করা হয়। মানে সে নিরন্তর বিধিতে থাকে, দিনেও আর রাত্রেও বিধিতে থাকে !!!

প্রকৃতিকে এভাবে মোড়ে জ্ঞানী

সবাই এমন ভাবে যে দাদাজী নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পরেছে। কিন্তু এই কথায় কোন তথ্য নেই। পদ্মাসন লাগিয়ে এক ঘন্টার মতো বসি, তা এই সাতাত্তর বছর বয়সে পদ্মাসন লাগিয়ে বসা কি সোজা কথা ? পা মুড়েও বসতে পারি আর সেজন্য চোখের শক্তি, চোখের দৃষ্টি ও সব সুরক্ষিত আছে।

যে সুখ আমি পেয়েছি, তা জগত পায়

আমি তো বলি যে ভাই আমি সাতাশ বছর ধরে (১৯৫৮ এ আত্মজ্ঞানের পর) মুক্তই আছি, বিনা কোন রকমের টেন্‌শনে। অর্থাৎ টেন্‌শন হতো এ. এম. প্যাটেল এর, আমার হতো না? কিন্তু এ. এম. প্যাটেল এর যত ক্ষণ পর্যন্ত টেন্‌শন থাকে, ততক্ষণ তো আমার জন্য বোঝ হয়েই থাকবে কি না! সেটা যখন পুরো হবে তখন আমি বুঝবো যে আমি মুক্ত হলাম আর তবুও যত ক্ষণ এই শরীর আছে ততক্ষণ বন্ধন

থাকবে। কিন্তু তার জন্য এখন আর আমার কোন আপত্তি নেই। দুই অবতার বেশী হলেও আমার আপত্তি নেই। আমার লক্ষ্য কি যে, 'এই যে সুখ আমি পেয়েছি সেই সুখ সমস্ত বিশ্ব পায়।' আর আপনার কোন তাড়া আছে বলুন। আপনার ওখানে পৌঁছানোর তাড়া আছে কি ?

দাদার ব্লেঙ্ক চেক

এই 'দাদাজী' এমন এক নিমিত্ত, যেমন 'দাদাজী'র নাম নিলে যদি বিছানায় অসুস্থ পড়ে আছে, বিছানায় নড়া-চড়া করতে পারছে না সেও উঠে দাঁড়ায়। সেইজন্য নিজের কাজ করিয়ে নাও। তুমি যে কাজ করতে চাও তা হতে পারে এমন। মানে নিমিত্ত এমন। কিন্তু ওতে খারাপ উদ্দেশ্য রাখবে না। কারো বিয়েতে যাবার জন্য শরীর ভাল হোক, এমন চাইবে না। এখানে সৎসঙ্গে আসার জন্য শরীর ভাল হোক এমন চাইবে। মানে কি 'দাদাজী'র সদুপযোগ করবে, ওনার দুরুপযোগ যেন না হয়। কারণ যদি দুরুপযোগ না করো তাহলে 'দাদাজী' আবার বিপদের সময় কাজে আসবে। সেইজন্য আমরা যেন ওনাকে নিরর্থক কাজে না জড়াই।

অর্থাৎ এটা দাদাজীর ব্লেঙ্ক চেক, সাদা চেক বলা হয়। সেটা বার-বার লাভের জন্য ব্যবহার করার মতো নয়। বড় বিপদ আসলে শৃঙ্খল টানবে। সিগারেটের প্যাকেট পড়ে গেলে রেলের শৃঙ্খল টানলে দন্ডিত হতে হবে কি না ? মানে এমন দুরুপযোগ করবে না।

আপনত্ব সমর্পণ করেছি

দেখ, আমি তোমাকে বলছি। আমার তো এসব খুঁজতে-খুঁজতে লম্বা সময় কেটে গেছে। সেইজন্য তোমাকে সোজা রাস্তা দেখাচ্ছি। আমাকে তো রাস্তা খুঁজতে হয়েছে। তোমাকে আমি যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথ দেখাচ্ছি, তালা খোলার চাবি দিয়ে দিচ্ছি।

এই যে অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল আছে, সে নিজের আপনত্ব ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। সেইজন্য ভগবান ওনাকে সব দিক থেকে সামলিয়ে রাখেন। আর এমন ভাবে সামলান,

সঠিকভাবে ! যখন থেকে নিজের আপনত্ব চলে গেছে, অহংকার চলে যাবার পর। বাকি, অহংকার চলে যাওয়ার মতো নয়।

সেইজন্য আমাকে ওখানে মুম্বাই আর বড়োদায় কিছু লোক বলে যে, 'দাদাজী, আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে ভাল হতো।' এতে আমি বলি, 'গাঁটরীর মতো উঠিয়ে নিয়ে আসেন তখন এখানে আসা হয় আর গাঁটরীর মতো উঠিয়ে নিয়ে যান তখন যাই।' এমন বললে ওরা বুঝে যায়। তবুও বলে 'গাঁটরীর মতো কেন বলছেন ?' আরে, এটা গাঁটরীরই তো, গাঁটরী না তো আর কি ? ভিতরে পূর্ণ রূপে ভগবান আছে, কিন্তু বাইরে তো গাঁটরীই না ! অর্থাৎ আপনত্ব থাকে নি।

মহাত্মা সব, এক দিন ভগবান হবেই

প্রশ্নকর্তা : আপনি যে বলেছিলেন কি, আমাদের সবাইকে আপনি ভগবান বানাতে চান, সে তো যখন হবো তখন হবো কিন্তু আজ তো হই নি ?

দাদাশ্রী : কিন্তু সেটা তো হবে ! কেননা এটা অক্রম বিজ্ঞান ! যে বানাবে সে নিমিত্ত আর যার হবার ইচ্ছা এই দুই যখন এসে মিলবে, তখন হবেই। বানানেবালা ক্লিয়ের (স্পষ্ট) আর আমাদের ও ক্লিয়ের, আমাদের আর কোন বৃত্তি নেই। সেইজন্য একদিন সমস্ত অন্তরায় মিটে যাবে আর ভগবান হবেই, যেটা আমাদের মূল স্বরূপ !

-জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
৯. সেবা-পরোপকার
১০. ভুগছে যে তার ভুল
১১. মানব ধর্ম
১২. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৩. দাদা ভাগবান কে ?
১৪. দান

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
11. Pure Love
12. Who am I
13. Right Understanding
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
27. Whatever has Happened is Justice
28. Guru and Disciple
29. Gyani Purush -A. M. Patel
30. The essence of religion
31. Pratikraman-Freedom Through Apology and Repentance

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটী ও হিন্দী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তেও উপলব্ধ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবানী" পত্রিকা হিন্দী,গুজরাটী ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অডালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর-৩৮২৪২১,
ফোন: (০৭৯)৩৯৮৩০১০০

কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪
মুম্বাই	: ৯৩২৩৫২৮৯০১	চেন্নাই	: ৯৩৮০১৫৯৯৫৭
জয়পুর	: ৯৩৫১৪০৮২৮৫	হায়দ্রাবাদ	: ৯৯৮৯৮৭৭৭৮৬
বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯	ভোপাল	: ৯৪২৫০২৪৪০৫
ইন্দোর	: ৯০৩৯৯৩৬১৭৩	জব্বলপুর	: ৯৪২৫১৬০৪২৮
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	ভিলাই	: ৯৮২৭৪৮১৩৩৬
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪
পুনে	: ৯৪২২৬৬০৪৯৭	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩

U. S. A : Dada Bhagwan Vignan Institute :
100, SW Redbud Lane, Topeka, Kansas 66606
Tel. +1 877-505-DADA (3232) ,
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. :	+44 330 111 DADA (3232)	**UAE :**	+971 557316937
Kenya :	+254 722 722 063	**Singapore :**	+65 81129229
Australia :	+61 421127947	**New Zealand :**	+ 64 21 0376434

Website : www.dadabhagwan.org

এখানে প্রকট হয়েছেন চৌদ্দ লোকের নাথ !

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা ভগবান' এই শব্দের প্রয়োগ কার জন্য করা হয়েছে ।

দাদাশ্রী : 'দাদা ভগবানের' জন্য, আমার জন্য নয় ! আমি তো 'জ্ঞানী পুরুষ' । 'দাদা ভগবান' যে চৌদ্দ লোকের নাথ যে তোমার মধ্যেও আছে, কিন্তু তোমার মধ্যে প্রকট হয়নি । তোমার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছে আর 'এখানে' (আমার ভিতরে) ব্যক্ত হয়ে গেছে, যে ব্যক্ত (প্রকট) হয়েছে সে ফল দেয় ।

-দাদাশ্রী

ISBN 978-93-87551-54-1

9 789387 551565

Printed in India

Price ₹ 30

dadabhagwan.org